মাজালিসে গাযযালী

ইমাম গাযযালী (রঃ)

islamibookbd.wordpress.com

মাজালিসে গায্যালী

লেখক
হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গায্যালী (রঃ)

অনুবাদ
হাফেয মাওলানা আবদুল জলিল

রশীদ বুক হাউস
৬, প্যারীদাস রোড,
ঢাকা-১১০০

islamibookbd.wordpress.com

আবু রাইয়ান মোঃ মুশফেকুর রহমান খান কর্তৃক
৭, জয়চন্দ্র ঘোষ লেন প্যারীদাস রোড,
বাংলাবাজার, ঢাকা হইতে প্রকাশিত

MAJALISH-E-GAZZALI

By : Emam Gazzali (R:)

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

-চতুর্থ মুদ্রণ
জানুয়ারী ২০০৮ইং

হাদিয়া ৮০.০০ টাকা

নাছিম প্রিন্টিং প্রেস এণ্ড কম্পিউটার্স
৭, জয়চন্দ্র ঘোষ লেন.
প্যারীদাস রোড
ঢাকা-১১০০

হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাযযালী (রঃ) আজ দুনিয়ায় যেমন পরিচয়ের অপেক্ষা রাখে না তেমনি তাঁর গ্রন্থরাজিও সমসাময়িক বিশ্বে মহামূল্যবান সম্পদরূপে বিবেচিত, সমাদৃত। এই মহামনীষীর গ্রন্থসমূহের একটি **'মাজালিসে গাযযালী'**। বইটি ইমাম গাযযালীর কতগুলি বিশেষ মজলিসে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য নসীহতের সমষ্টি।

ষাটের দশকে আমার এক বন্ধু লাহোর থেকে বইটির এক কপি উর্দু অনুবাদ নিয়ে আসেন এবং আমার হাতে দিয়ে বলেন, **"বইটির বাংলা অনুবাদ সমাজের জন্য অত্যন্ত উপকারে আসবে বলে আমার বিশ্বাস। তুমি এ কাজটি করতে পার।"** দুঃখের বিষয়, তাঁর অনুরোধ যখন রক্ষা হল এবং পুস্তক আকারে প্রকাশ পেল তখন আর তিনি নেই। তাঁর আত্মার শান্তি হোক।

এই অনন্য পুস্তকখানি বাংলা ভাষাভাষীদের জ্ঞানকে যেমন করবে সমৃদ্ধ, তেমনি উজ্জীবিত হবে তাদের ঈমানী জ্যোতি।

আমার আশা, মহামনীষীর এই অমূল্য গ্রন্থ ঘরে ঘরে স্থান পাবে ও জীবন জ্যোতির্ময় হয়ে উঠবে। বইটি সাতাশটি মজলিসে বিভক্ত। প্রতিটি মজলিস ভিন্ন ভিন্ন বিষয়বস্তু সম্বলিত। আমরা বিষয়বস্তুর উপরই ভাগ করেছি। আমিন।

-অনুবাদক

islamibookbd.wordpress.com

সূচীপত্র

ওলীদের কাশফ ও কারামত (১)	৭
সৃষ্টি রহস্য	১৭
এলম ও আমল	২১
সুলুক ও আহলে সুলুক	২৫
সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য	৩০
লায়লাতুর রাগায়েব	৩৪
বেহেশতের উত্তম খাদ্য	৪১
পীরের পরিচয়	৪৬
বিচারক	৪৯
সুখ-দুঃখ	৫২
পরস্পর ভালবাসা	৫৫
কোরআনের ফযীলত	৫৭
তাকবীর দেওয়া	৬০
হজ্জ	৬৪
ওলীদের কাশফ ও কারামত (২)	৬৮
পরিণাম	৭৪
নফ্‌স	৭৮
রমযান মাসে মোমেনের মৃত্যু	৮৬
দোযখের উত্তাপ	৯০
মহব্বত	৯৩
পাপী বান্দা দয়ালু আল্লাহ	৯৭
শবে বরাত	১০৪
শরীয়ত ও হাকীকত	১০৭
মিলন সেতু	১১১
চরিত্রের পরিবর্তন	১১৪
হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী	১১৭
তওবা	১২৪

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রথম মজলিস

ওলীদের কাশ্‌ফ ও কারামত

ছাব্বিশে সফর, বৃহস্পতিবার। পবিত্র দরবারে বহু আলেম-ওলামা এবং আল্লাহর বিশিষ্ট বান্দাদের উপস্থিতিতে ওলীদের কাশ্‌ফ ও কারামত সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা হইতেছিল। হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গায্‌যালী (রঃ) বলিলেন–

ভাইসব ! শায়খের কলবের শক্তি এবং পবিত্রতা এই পরিমাণ হইতে হইবে যে, যখন কোন লোক তাহার নিকট আল্লাহর ওয়াস্তে বায়আত গ্রহণ করিতে আসে তখন প্রথমেই শায়খ তাহার বাতেনী দৃষ্টি দ্বারা বায়আত গ্রহণে আগত ব্যক্তির নফ্‌সদেশে পৃথিবীর প্রতি যেই মায়া-মোহ রহিয়াছে উহা দূর করিয়া দিবেন, যেন তাহার মাঝে হিংসা, বিদ্বেষ, লোভ-লালসা, দুনিয়ার প্রতি আসক্তি এবং মায়া-মোহ কোন কিছুই অবশিষ্ট না থাকে। এই প্রাথমিক কাজ সমাধা করার পর তাহাকে বায়আত করিবেন এবং আল্লাহপ্রাপ্তির পথে আনিয়া দাঁড় করাইবেন।

এই শক্তি যখন শায়খের মধ্যে থাকিবে না তখন অবশ্যই মনে করিবে, এই পীর ও মুরীদ উভয়েই গোমরাহীর জঙ্গলে উদ্দেশহীনভাবে দিশাহারা হইয়া ঘুরাফেরা করিবে। কোন মতেই তাহারা মনযিলে মকসূদে পৌছিতে সক্ষম হইবে না।

তিনি বলিলেন, একবার এক বুযুর্গ দেশ পর্যটনে বাহির হইলেন। বহু দেশ ঘুরাফেরা করার পর তিনি বদখ্‌শান আসিয়া পৌছেন। এই বুযুর্গ বলেন, এখানে আসিয়া আমি এক বুযুর্গের খানকায় উপস্থিত হই। এই বুযুর্গ এমনই আল্লাহ্ ওয়ালা এবং খোদাভীরু ছিলেন যে, তা বর্ণনাতীত। আমি তাঁহাকে সালাম করিলাম। তিনি হাসিমুখে সালামের উত্তর দিয়া তাঁহার পাশেই আমাকে বসাইলেন। আমি তাঁহার খেদমতে কিছু দিন থাকার মনস্থ করিলাম।

তিনি প্রতিদিন রোযা রাখিতেন। ইফতারের সময় হইলে গায়েব হইতে তাঁহার নিকট দুইখানি রুটি আসিত। তিনি একখানি দ্বারা ইফতার করিতেন এবং অন্য রুটিখানি আমাকে দিতেন। একদিন এই বুযুর্গ শহরের শাসনকর্তাকে দরবারে

islamibookbd.wordpress.com

ডাকিয়া আনিয়া বলিলেন, আমার জন্য দুইটি খানকা তৈয়ার কর।

শাসনকর্তা খানকা তৈয়ার করিয়া দরবেশকে সংবাদ দিলেন। দরবেশ শাসনকর্তাকে প্রত্যহ একটি গোলাম কিনিয়া দিতে বলিলেন। শাসনকর্তা প্রতিদিন বাজার হইতে একজন করিয়া গোলাম ক্রয় করিয়া আনিয়া তাঁহাকে দিতেন। বুযুর্গ ক্রীতদাসের হাত ধরিয়া খানকায় লইয়া যাইতেন এবং সাজ্জাদায় বসাইয়া বলিতেন, আমি তোমাকে আল্লাহর নিকট সোপর্দ করিলাম। এইভাবে খানকাদ্বয় আবাদ হইয়া গেল।

তাহাদের মর্যাদা এমনই উন্নত মানের হইল যে, তাহারা অনায়াসে পানির উপর দিয়া চলিয়া যাইতে পারিতেন। যাহাকে যেই কথা বলিয়া দিতেন তাহা কার্যে পরিণত হইত। এই অবস্থা দেখিয়া আমার বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না। আমার অবস্থা দেখিয়া উক্ত বুযুর্গ বলিলেন, ভাই ! ইহাতে বিস্ময়ের কি আছে ? সাজ্জাদার অধিকারী তো ঐ ব্যক্তি, যে কোন ব্যক্তির হাত ধরিয়া তাহাকে সাজ্জাদার অধিকারী বানাইয়া দিতে পারে। যাহার মধ্যে এই শক্তি নাই সে আবার কিসের পীর ? বরং সে তো সুলুকধারীদের মধ্যে মিথ্যাবাদী।

অতঃপর হুজ্জাতুল ইসলাম এরশাদ করিলেন, পুরুষের পৌরুষ বা পূর্ণতা চারিটি বস্তু দ্বারা সাধিত হয়। যথা– কম নিদ্রা যাওয়া, কম আহার করা, কম কথা বলা এবং লোকের সাথে অপারগতায় মেলামেশা করা।

তিনি বলিলেন, গজনীতে একজন অবিবাহিত দরবেশ ছিলেন। সমস্ত দিন তিনি যাহা কিছু পাইতেন রাত পর্যন্ত তাহা দান করিয়া দিতেন। একটি কপর্দকও নিজের জন্য রাখিতেন না। আবার রাতে কিছু পাইলে দিনে তাহা দান করিয়া দিতেন। ছোট হউক বা বড়, দরবেশ হউক বা ধনী, যেকোন লোকই তাঁহার নিকট আসিত, কেহই খালি হাতে যাইত না। যদি কোন ব্যক্তি বস্ত্রহীন অবস্থায় আসিত তিনি তাঁহার পরিধেয় ভাল কাপড় খুলিয়া তাহাকে দান করিতেন। এই দরবেশ খুবই দানশীল এবং মুক্তহস্ত ছিলেন। আমি বহু দিন তাঁহার সাথে অবস্থান করি।

একদিন এই দরবেশ আমাকে বলিলেন, আমি একাদিক্রমে চল্লিশ বৎসর কৃচ্ছ্র সাধনা করিয়া আল্লাহর এবাদত-বন্দেগীতে ডুবিয়া রহিয়াছি। কিন্তু এই দীর্ঘ সময়ে আমি আমার মধ্যে এমন কোন নূর এবং উন্নতি দেখিতে পাই নাই যাহা চারিটি বিষয় অবলম্বন করার পর দেখিতে পাইয়াছি। অর্থাৎ, কম খাওয়া, কম কথা বলা,

কম নিদ্রা যাওয়া, এবং লোকের সাথে কম মেলামেশা করা। এই নিয়ম মুখ্য ব্রত হিসাবে গ্রহণ করার পর আমি আকাশের দিকে তাকাইলে আল্লাহর আরশ পর্যন্ত দেখিতে পাই। ইহাতে কোন কিছুই আমার দৃষ্টিপথে অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায় না। আবার যখন মাটির দিকে দৃষ্টিপাত করি, তখন সপ্ততল যমীনে যাহা কিছু আছে উহার সব কিছুই আমি দেখিতে পাই।

অতঃপর বলিলেন, হে দরবেশগণ ! যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা কম না খাইবে, কম কথা না বলিবে, কম নিদ্রা না যাইবে এবং লোকের সাথে কম মেলামেশা না করিবে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের কেহই দরবেশীর রত্নভাণ্ডার আয়ত্ত করিতে পারিবে না।

প্রকৃত দরবেশ তো তাহারাই যাহারা নিদ্রা হারাম করিয়া দিয়াছেন ; কথা বলা পরিত্যাগ করিয়া বোবায় পরিণত হইয়াছেন, লতাপাতা চিবাইয়া জীবন রক্ষা করেন এবং লোকসঙ্গকে হলাহলতুল্য মনে করেন। এই গুণাবলী অর্জন করার পরই আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের মর্তবায় উপনীত হওয়া যায়।

স্মরণ রাখিও, ভাল পেশাক পরিধান করিলে লোকে তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিবে, জনসমাজ তাহাকে সম্মান করিবে, এই আশায় যে উৎকৃষ্ট পোশাক পরিধান করে সে সুলুকের পথের মিথ্যাবাদী। যে দরবেশ প্রবৃত্তির তাড়নায় পেট ভরিয়া খায়, আলস্য নিদ্রায় গা ভাসাইয়া দেয় এবং অযথা লোকের সাথে মেলামেশা পছন্দ করে, সে তো দরবেশ নামের কলঙ্ক।

তিনি এরশাদ করিলেন, একবার আমি নদী পথে ভ্রমণ করিতেছিলাম। এই সময় এমন একজন দরবেশের সাথে আমার সাক্ষাত হইল, অত্যধিক রিয়াযত-মুজাহাদা করার দরুন তাঁহার দেহের চামড়া হাড়ের সাথে মিলিয়া গিয়াছিল। কিন্তু নিয়ম ছিল, চাশতের নামায আদায় করার পর তাঁহার সম্মুখে দস্তরখানা বিছানো হইত এবং প্রায় হাজার মণ পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য তাহাতে রাখা হইত। যে কেহ তাঁহার নিকট আসিত সে-ই খাইত। অথচ তিনি রোযা রাখিতেন। চাশত হইতে যোহর পর্যন্ত এইভাবে পানাহার চলিত এবং বস্ত্রহীনকে বস্ত্রদান করিতেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি কিছুই তাঁহার নিকট রাখিতেন না।

ইহার পরও বলিতেন, যাহার যাহা কিছুর প্রয়োজন আমার নিকট আস। অতঃপর কেহ তাঁহার নিকট আসিলে জায়নামাযের নিচে হাত দিতেন, যাহা কিছু

islamibookbd.wordpress.com

হাতে আসিত তাহাই দান করিতেন। ইফতারের সময় আলমে গায়েব হইতে চারিটি খুরমা আসিত। আমাকে দুইটি দিতেন এবং নিজে দুইটি দ্বারা ইফতার করিতেন। তিনি আমাকে বলিতেন, কম কথা বলা, কম খাওয়া, কম নিদ্রা যাওয়া এবং নির্জনতা অবলম্বন করা ব্যতীত কেহই দরবেশের মর্যাদা লাভ করিতে পারে না।

হযরত ঈসা (আঃ) সম্বন্ধেও তিনি এই জাতীয় একটি কাহিনীতে এরশাদ করিলেন যে, যালেমদের হাত হইতে উদ্ধার করিয়া যখন হযরত ঈসা (আঃ)-কে চতুর্থ আসমানে নেওয়া হইল, তখন মহান আল্লাহ নির্দেশ দিলেন, তাহাকে ঐখানেই রাখ। এখনও তাহার নিকট পার্থিব সুখ-সম্পদের বস্তু রহিয়াছে।

হযরত ঈসা (আঃ) এই বাণী শুনিয়া বিস্মিত হইলেন এবং লক্ষ্য করিতে লাগিলেন, পার্থিব সুখ-সম্পদের কোন্ বস্তু তাঁহার নিকট এখনও অবশিষ্ট রহিয়াছে। দেখিলেন, একটি সুই এবং এক পেয়ালা চর্বি রহিয়াছে। তিনি আরয করিলেন, হে পরওয়ারদেগারে আলম ! এখন আমি ইহা কি করিব ?

এরশাদ হইল, তুমিই তোমার পায়ে কুঠারাঘাত হানিয়াছ। তুমি কি উহা পৃথিবীতেই ফেলিয়া আসিতে পার নাই ? সুতরাং আর সম্মুখে অগ্রসর হইতে পারিবে না, ঐখানেই অবস্থান কর।

অথচ এই হযরত ঈসা (আঃ) জীবনে বিবাহ করেন নাই, রৌদ্র-বৃষ্টি হইতে আত্মরক্ষা করার জন্য ঘর-বাড়ী তৈয়ার করেন নাই। বিশ্রাম করার প্রয়োজন হইলে একখণ্ড পাথর, ইট বা অন্য কিছু মাথার নিচে দিয়া ক্ষণিকের জন্য বিশ্রাম করিয়া লইতেন।

বর্ণিত আছে, হযরত ঈসা (আঃ) মাথার চুল ও দাড়ি আঁচড়ানোর জন্য একখানা চিরুনি এবং একটি পানপাত্র সর্বক্ষণ সাথে রাখিতেন। একদিন নদীর তীর দিয়া যাওয়ার সময় দেখিতে পাইলেন, এক ব্যক্তি অঞ্জলি ভরিয়া পানি পান করিতেছে। তিনি ভাবিলেন, তাই তো ! অঞ্জলি ভরিয়াই যখন পানি পান করা যায় তখন আর পানপাত্র কেন ? সাথে সাথেই তিনি পানপাত্র দূরে ফেলিয়া দিলেন। আর একদিন দেখিলেন, এক ব্যক্তি হাতের আঙ্গুল দ্বারা মাতার চুল ও দাড়ি বিন্যাস করিতেছে। সেই দিন হইতে তিনি চিরুনিও আর সাথে রাখিলেন না।

হে দরবেশগণ ! এখানে চিন্তা করিয়া দেখার বিষয় যে, হযরত ঈসা (আঃ) ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বস্তু সাথে রাখার জন্য সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার অনুমতি পাইলেন না ; বরং চতুর্থ আসমানেই থাকিতে হইল। সেই ক্ষেত্রে যাহারা পার্থিব বিষয়বস্তুর সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত, তাহারা কিভাবে বন্ধুর দরবারে পৌঁছার আশা পোষণ করিতে পারে।

দরবেশের কর্তব্য সর্বক্ষণ বিস্ময়াপন্ন থাকা। কেননা, তিনি প্রতিদিন এক স্থান হইতে অন্য স্থানে এবং এক দেশ হইতে অন্য দেশে গমন করেন। এইভাবে তিনি একটির পর একটি উন্নতির সোপান অতিক্রম করিয়া যান।

এক দরবেশ সম্বন্ধে বর্ণিত আছে, তিনি সব সময় চিন্তা-ভাবনা করিতেন এবং বিস্ময়াপন্ন হইয়া থাকিতেন। লোকে তাঁহাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন, আমার প্রতিটি পলক এমন এক দেশের উপর পড়ে যাহা প্রথমটি হইতে শত গুণে বড়। প্রতিটি দেশই প্রথমটি হইতে অধিক রহস্যময়। সুতরাং এই রহস্য স্বচক্ষে দেখিয়াই আমি বিস্ময়াভিভূত হইয়া পড়ি।

এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চক্ষুদ্বয় অশ্রুসিক্ত হইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ নিচের দিকে মাথা রাখিয়া আবার বলিলেন, বিস্ময়াভিভূত আহলে সুলুক বলেন, দরবেশ তাহাকে বলা হয় যিনি প্রতিদিন হাজার হাজার দেশ অতিক্রম করিয়া যান এবং তাহাতেই নিমগ্ন থাকেন। যেই দরবেশ আলমে গায়েব হইতে কোন সংবাদ পায় না সে দরবেশ নহে।

অতঃপর বলিলেন, আল্লাহর কোন কোন ওলী প্রেমাধিক্য এবং মত্ততার (সুকর) অবস্থায় কিছু কিছু রহস্য প্রকাশ করিয়া দেন। আবার এমন ওলীও আছেন যাঁহারা কোন অবস্থায়ই রহস্য প্রকাশ পাইতে দেন না। অতএব এই পথে সুলুকধারীদের শক্তি-সাহস আরও প্রশস্ত হওয়া উচিত, যেন রহস্য তাঁহার মধ্যেই সীমিত থাকে। কারণ, মাহবুবের রহস্যে যে পূর্ণতাপ্রাপ্ত, সে তাহা কখনও নষ্ট হইতে দেয় না। বহু দিন পর্যন্ত আমি আমার মুরশিদের খেদমতে অবস্থান করিয়াছি। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে আমি কোন দিন শুনি নাই যে, তিনি রহস্যময় কোন কথা বলিয়াছেন। আর আমি ইহাও দেখি নাই যে, তাঁহার মধ্যে যে নূরের আবির্ভাব হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিয়াছেন।

islamibookbd.wordpress.com

কামেল দরবেশের অবস্থা তো এমন যে, তিনি কোন মতেই রহস্য প্রকাশ হইতে দেন না। ফলে অন্য রহস্য সম্বন্ধে তিনি অবগত হইতে পারেন। তাই মানসূর হাল্লাজ যদি পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতেন তবে কখনও তিনি তাঁহার বন্ধুর রহস্য লোক সমাজে প্রকাশ করিতেন না। বন্ধুর রহস্যের সামান্য কিছুটা প্রকাশ করার ফলেই তিনি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন।

হযরত মানসূর হাল্লাজের এক বোন ছিলেন উঁচু স্তরের একজন ওলী। অর্ধ রাত অতিবাহিত হওয়ার পর তিনি ঘর ছাড়িয়া বাগদাদের উন্মুক্ত মরুভূমিতে চলিয়া যাইতেন এবং একাগ্র চিত্তে বহুক্ষণ আল্লাহর এবাদত-বন্দেগীতের লিপ্ত থাকিতেন। বাড়ী ফিরার সময় হইলে আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদিগকে বলিতেন, আমার প্রেম মদিরার এক পেয়ালা বেহেশতী সুরা তাহাকে পান করিতে দাও। ফেরেশতাগণ পানপাত্র তাঁহার হাতে তুলিয়া দিতেন। তিনি উহা পান করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতেন।

হযরত মানসূর বোনের গৃহ হইতে বাহির হইয়া যাওয়ার বিষয় অবগত হইতে পারিলেন। বোন কোথায় যায় জানার জন্য এক রাতে তাঁহার পিছনে পিছনে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। নিয়মিতভাবেই বাড়ী ফিরার পূর্বে ফেরেশতাগণ তাঁহার সম্মুখে পানপাত্র ধরিলেন। তিনি প্রেম সুধার সামান্য পরিমাণ পান করিতেই মানসূর পিছন হইতে ডাকিয়া বলিলেন, বোন ! তুমি একা পান করিও না, আমাকে একটু দাও।

পিছনে ফিরিয়া ভাইকে দেখিয়া তো তিনি অবাক! তিনি বলিলেন, হায় অদৃষ্ট ! আমার এতদিনের রহস্য আজ প্রকাশ পাইয়া গেল ! তারপর ভাইকে বলিলেন, তুমি ইহা পান করিও না। আমার বিশ্বাস, তুমি ইহার প্রভাব সহ্য করিতে পারিবে না। ভাই তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না। সেই সুধা পান করিলেন। আর যায় কোথায় ! সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইয়া পড়িল, আনাল হক। আমিই সত্য।

ভাইয়ের অবস্থা দর্শনে বোন দুঃখে কাঁদিয়া ফেলিলেন। বলিলেন, ওহে অপদার্থ! আমার কথা না শুনিয়া নিজেও দুর্নামগ্রস্ত হইলে আর সাথে সাথে আমাকেও হেয় করিয়া ছাড়িলে।

ইহার পর মানসূর প্রকাশ্য জনসমাজে আনাল হক, আনাল হক বলিয়া বেড়াইতে থাকেন। শরীয়তমতে তাঁহাকে শূল দণ্ডে দণ্ডিত করা হইল। শূলে চড়ানোর পূর্বে বোন তাঁহার নিকট গিয়া বলিলেন, মানসূর ! আমি না তোমাকে বলিয়াছিলাম, উহা পান করার শক্তি তোমার নাই। আমার কথায় কর্ণপাত না করিয়া আজ সর্বসাধারণ্যে বন্ধুর রহস্য প্রকাশ করিয়া দিয়া মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইলে।

লোকে বলাবলি করিতে লাগিল, মানসূর এমন পৌরুষের অধিকারী ছিলেন যে, বন্ধুর প্রেমে স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিলেন। কিন্তু বোন লোকের কথা শুনিয়া বলিলেন, মানসূর ছিল একজন কাপুরুষ। সে পৌরুষের অধিকারী হইলে সামান্য পরিমাণ প্রেম মদিরা পান করিয়া এমনভাবে বিপথগামী হইত না। আমি আজ বিশ বৎসর যাবত এই মদিরা পান করিয়া আসিতেছি, অথচ আমি তো কোন দিন বিপথে চলি নাই। বরং বলিয়াছি, আরও দাও।

হযরত জোনায়েদ (রঃ) যখন প্রেমবিহ্বল অবস্থায় থাকিতেন, তখন শুধু এই কথাই বলিতেন যে, প্রেমিক সম্প্রদায়ের জন্য হাজার আফসোস, তাহারা প্রেম ও বন্ধুত্বের দাবী করে, তারপর আলমে গায়েব হইতে তাহাদের উপর যে রহস্য অবতীর্ণ হয় তাহা লোক সমাজে প্রকাশ করিয়া বেড়ায়।

আমি আমার পীর ও মুরশিদের নিকট শুনিয়াছি, একজন বুযুর্গ কয়েকশত বৎসর পর্যন্ত আল্লাহর এবাদত ও মুজাহাদায় নিয়োজিত থাকেন। একদিন তাঁহার উপর প্রেম রহস্য প্রকাশ লাভ করিল। তিনি কিছুটা দুর্বল প্রকৃতির থাকায় তাহা সহ্য করিতে পারিলেন না। সাথে সাথে প্রকাশ করিয়া দিলেন। দ্বিতীয় দিন তাঁহার নিকট হইতে সেই রহস্য ছিনাইয়া লওয়া হইল। দরবেশ সেই দুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িলেন।

গায়েবী আওয়ায হইল, ওহে দরবেশ ! তুমি যদি এই রহস্য প্রকাশ না করিতে, তবে তোমাকে আরও অনেক কিছু দান করা হইত। সুতরাং তুমি উহার উপযুক্ত না হওয়ায় তোমার নিকট হইতে ছিনাইয়া লইয়া অন্যকে দান করা হইয়াছে।

একবার এক বুযুর্গ আর এক বুযুর্গের নিকট লিখিলেন, ঐ ব্যক্তি সম্বন্ধে আপনার কি অভিমত যে এক পেয়ালা প্রেম সুধা পান করিয়াই বলিয়া উঠে, আমি

islamibookbd.wordpress.com

অনেক কিছু পাইয়াছি। দরবেশ উত্তরে লিখিলেন, এমন ব্যক্তি তো অত্যন্ত দুর্বলচেতা। যেব্যক্তি সমুদ্রের পর সমুদ্র প্রেম সুধা পান করিয়াও হজম করিয়া ফেলে এবং বলে, আরও দাও, সে-ই বাহাদুর ! কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, তোমরা কখনও এইরূপ করিও না। কারণ, যাহারা গোপন রহস্য প্রকাশ করে তাহারা কিছুই অর্জন করিতে পারে না।

দরবেশ যতক্ষণ পর্যন্ত নির্জনতা অবলম্বন করিয়া যাবতীয় সম্পর্ক পরিত্যাগ না করে, সে কোন দিনও আল্লাহর নৈকট্য লাভ করিতে সক্ষম হয় না। সত্তর বৎসর পর হযরত বায়েজীদ (রঃ) যখন আল্লাহ নৈকট্য লাভে সমর্থ হন, তখন নির্দেশ দেওয়া হইল, তাহাকে ফিরাইয়া লইয়া যাও। কেননা, এখনও তাহার নিকট পার্থিব উপকরণ রহিয়াছে। তিনি চিন্তা করিলেন, আমার নিকট কি আছে ? লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন, একটি চামড়ার ছেঁড়া জামা এবং একটি ভাঙ্গা পানপাত্র। তিনি তখনই উহা ফেলিয়া দিয়া প্রতিবন্ধকতা দূর করিলেন।

ভাইসব ! এমন একজন বুযুর্গ যখন এই সামান্য বস্তুর জন্য আল্লাহর নৈকট্য লাভে সমর্থ হন নাই, তখন তোমার আমার ঠিকানা কোথায় ? আমরা তো পার্থিব আসবাব-উপকরণ দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া রহিয়াছি। পৃথিবীর মায়াজালে আবদ্ধ। হে দরবেশ ! দরবেশী এক বস্তু, সঞ্চয় করা অন্য বস্তু। প্রকৃত দরবেশ তো-ঐ ব্যক্তি, তিনি যাহা মুখে বলেন তাহা কার্যে পরিণত হয়, একটুও এদিক সেদিক হয় না।

একবার আমি এবং আমার একজন অন্তরঙ্গ সাথী নদী পথে ভ্রমণ করার জন্য রওয়ানা হই। হঠাৎ আমরা আল্লাহর কুদরতের এমন একটি নিদর্শন দেখিতে পাই যাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। নদীর তীরে আমরা বসা। ক্ষুধার তাড়নায় অস্থির। একদিকে জঙ্গল অন্য দিকে নদী। কোথায় পাই খাবার বস্তু। এমন সময় একজন কাফ্রী আসিয়া আমাদের সম্মুখে দুইখানি যবের রুটি রাখিয়া চলিয়া গেল। আমরা আল্লাহর এই নেয়ামত খাওয়া আরম্ভ করিলাম।

হঠাৎ আমাদের চোখে পড়িল, উটের সমান একটি বিচ্ছু দ্রুতবেগে নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া ততোধিক দ্রুত গতিতে নদীর অপর তীরের দিকে ধাবিত হইয়াছে। আমরা মনে করিলাম, নিশ্চয়ই কোন প্রয়োজনে উহা যাইতেছে। কি প্রয়োজন দেখার জন্য আমরাও উঠিয়া দাঁড়াইলাম। কিন্তু কিভাবে নদী অতিক্রম

করিব ? আমরা আল্লাহর নিকট দোআ করিলাম। নদীর পানি দুই ভাগ হইয়া আমাদের পথ করিয়া দিল। নদী পার হইয়া দেখিলাম, একটি গাছের তলায় এক ব্যক্তি গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত। আরও দেখিলাম, বিরাট এক অজগর তাহাকে দংশন করার জন্য গাছ হইতে নামিয়া আসিতেছে। ইত্যবসরে উট সদৃশ সেই বিচ্ছু অজগরটিকে দংশন করিল। অজগরটি সাথে সাথে মরিয়া গেল। বিচ্ছুটিও আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে চলিয়া গেল।

আমরা মনে করিলাম, এই ব্যক্তি নিশ্চয়ই আল্লাহর ওলী, যাঁহাকে অজগরের দংশন হইতে রক্ষা করার জন্য আল্লাহ তাআলা এই বিচ্ছুটিকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। আমরা উক্ত ব্যক্তির নিকট গিয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে আমাদের বিবেক-বুদ্ধি লোপ পাইয়া গেল। দেখিলাম, তাহার পাশে মদের বোতল। অতিরিক্ত মদ পান করার দরুণ সে বমি করিয়া নিস্তেজ হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। দুর্গন্ধে তাহার নিকট যাওয়া মুশকিল। আমরা চিন্তা করিতেছিলাম, আল্লাহর এই নিকৃষ্টতম জীবের অবস্থা দেখার জন্য আমরা কেন এখানে আসিলাম !

এমন সময় গায়েব হইতে আওয়ায হইল, ওহে আমার প্রিয়তম বন্ধুদ্বয় ! আমি যদি আমার নেকবখত এবং পুণ্যবানদিগকেই বক্ষণাবেক্ষণ করি তবে আমার গুনাহগার বান্দাদিগেক কে রক্ষা করিবে ?

ইত্যবসরে সেই ব্যক্তি জাগ্রত হইয়া পাশে মৃত অজগর এবং আমাদিগকে দেখিয়া অবাক হইয়া তওবা করিল। পরবর্তী সময়ে এই ব্যক্তি খালি পায়ে হাঁটিয়া সত্তরবার হজ্জ করিয়াছিল।

বন্ধুগণ ! যখন মেহেরবানীর বাতাস প্রবাহিত হইতে থাকে, তখন শত পাপী অপরাধীজনকেও সাজ্জাদার অধিকারী করিয়া দেয়। খোদা না করুন, আবার কখনও যদি ক্রোধের হাওয়া প্রবাহিত হয়, তখন যত বড় সাজ্জাদার অধিকারীই হউক না কেন তাহাকে সাজ্জাদা হইতে বঞ্চিত করেন। সুতরাং এই পথের পথিক কখনও নির্ভয় এবং নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না। কারণ, সে তাহার পরিণতি ভাল হইবে কি মন্দ হইবে কিছুই বুঝিতে পারে না।

অভিশপ্ত শয়তান যদি তাহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে জ্ঞাত থাকিত, তবে সে অবশ্যই হযরত আদম (আঃ)-কে সেজদা করিত। সে তাহার পরিণতি সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিল বলিয়াই স্বীয় এবাদত-বন্দেগী, রিয়াযত-মুজাহাদার অহংকার করত নিজেকে

islamibookbd.wordpress.com

সকলের চেয়ে গুণী-জ্ঞানী মনে করিয়াই বলিয়া ফেলিল, আমি মাটির তৈয়ারী মানুষকে সেজদা করিব না। ফলে সে নাফরমান হইল। আল্লাহর নির্দেশ পালন না করিয়া বিতাড়িত হইল। তাহার সকল এবাদত-বন্দেগী ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইল। এতদিনের এবাদত-বন্দেগী তাহার মুখের উপর নিক্ষেপ করা হইল।

এই কথা বলিয়া তিনি অঝোর নয়নে কাঁদিতে থাকেন। উপস্থিত সকলেও তাঁহার সাথে ক্রন্দন করিতে থাকেন। কিছুক্ষণ পর তিনি মোনাজাত করিয়া সকলকে সেই দিনের মত বিদায় দিলেন।

দ্বিতীয় মজলিস

সৃষ্টি রহস্য

সাতাশে সফর, শুক্রবার। আমি দরবার শরীফে উপস্থিত হইয়া আরয করিলাম, হুযুর (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তাঁহার সৃষ্টিকে অন্ধকারে সৃষ্টি করিয়া পরে স্বীয় নূর দ্বারা আলোকিত করেন। ইহার অর্থ বুঝিতে পারিলাম না।

হযরত পীর ও মুরশিদ বলিলেন, যাবতীয় কিছুর সৃষ্টি অন্ধকারে হইয়াছিল। পরে আল্লাহর নূরে সেইসব আলোকিত হয়; প্রত্যেকে স্বীয় ক্ষমতানুযায়ী সেই নূরের জ্যোতি গ্রহণ করিয়া আলোকোজ্জ্বল হয়। সৃষ্টিতে যে নূর আছে তাহা আল্লাহর নূর হইতে বিচ্ছিন্ন নহে। যেমন সূর্যোদয় হইলে রাতের অন্ধকার দূর হইয়া আলোকোজ্জ্বল দিন প্রকাশ পায়। কিন্তু এই আলো আংশিক ও খণ্ডিত নহে। এমনও নহে যে, অন্ধকার বাড়িয়া যায় অথবা অন্ধকার আলোময় হইয়া যায়, অথবা স্বয়ং সূর্যের আলোর ঘাটতি হয়। অন্ধকার এক বস্তু, আলো অন্য বস্তু; বরং একটি অনটির বিপরীত। আবার সূর্যোদয়ের পর চাঁদের আলো চলিয়া যায়। কোন কোন তারকা চন্দ্রের আলোর প্রভাবে স্তিমিত হইয়া পড়ে।

ইহার পর বলিলেন, যেমন হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, পুণ্যশীলদের পুণ্য আল্লাহর নৈকট্য লাভকারীদের জন্য পাপস্বরূপ। পাপ এবং পুণ্য সম্পূর্ণরূপে বিপরীতধর্মী। তাই পুণ্য কিভাবে পাপে পরিণত হয়?

উত্তর এই যে, পুণ্যবানদের পুণ্য নৈকট্য লাভকারীদের পাপ এই অর্থে যে, পুণ্যবানদের পুণ্য বড় এবং নৈকট্য লাভকারীদের পুণ্য উহার চেয়েও অধিক শ্রেষ্ঠ। নৈকট্য লাভকারীগণ যখন মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ, তখন তাহাদের পক্ষে তাহাদের মর্যাদার দিক হইতে সাইয়্যেআহ্‌কে পাপ বলা হইয়াছে। যদিও তাহাদের পদমর্যাদায় স্বয়ং হাসান অর্থাৎ সুন্দর। কিন্তু অধিক সুন্দরের দিক হইতে কম মর্যাদাসম্পন্ন। এদিকে ইঙ্গিত করিয়াই হুযুর (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, পুণ্যবানদের পুণ্য নৈকট্য লাভকারীদের জন্য পাপস্বরূপ। আল্লাহ অধিক জ্ঞাত।

ইহার পর এরশাদ করিলেন, হযরত আদম (আঃ) এই ভুলই করিয়াছিলেন।

islamibookbd.wordpress.com

কারণ, তিনি শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠতর। সেই কাহিনী হইল, আল্লাহ তাআলা আদম (আঃ)-কে নির্দেশ দিলেন, হে আদম ! তুমি এবং তোমার স্ত্রী জান্নাতে আরামে বসবাস কর এবং বেহেশতের নেয়ামত যাহা ইচ্ছা পানাহার কর। কিন্তু ঐ বৃক্ষের নিকট যাইও না। (যদি যাও) তবে উভয়ে নাফরমান বলিয়া পরিগণিত হইবে।

একমাত্র গম ব্যতীত বেহেশতের যাবতীয় কিছু হযরত আদম ও হাওয়া (আঃ)-এর জন্য আল্লাহ মোবাহ বা বৈধ করিয়া দিয়াছিলেন। হযরত আদম (আঃ) যখন বেহেশতে প্রবেশ করেন, তখন নিষিদ্ধ বৃক্ষটি তাঁহার যতটা ভাল মনে হইল, অন্য কোন নেয়ামতই ততটা পছন্দ হইল না। নিষিদ্ধ গাছের প্রতি দৃষ্টি পড়িতেই তাহা তাঁহার নিকট খুব ভাল মনে হইতে লাগিল।

হাদীস শরীফে আছে, মানব চরিত্রের বৈশিষ্ট্য হইল, যে বস্তু হইতে মানুষকে বিরত থাকিতে বলা হয় উহার প্রতিই তাহার আসক্তি বেশী থাকে, উহার প্রতিই সে বেশী আকৃষ্ট হয়।

হযরত আদম (আঃ) স্বীয় এজতেহাদ ও শয়তানের প্ররোচনায় পড়িয়া সেই নিষিদ্ধ বস্তুই ভক্ষণ করিলেন। যে গাছের ফল খাইতে নিষেধ করা হইয়াছিল। অবশ্য ঠিক ঐ গাছের ফল খান নাই। কারণ, বেহেশতে ঐ একই জাতীয় গাছ বহু প্রকারের ছিল।

তিনি যখন ঐ গাছের ফল খাওয়ার মনস্থ করিলেন, তখন ভাবিলেন, আমাকে বিশেষ একটি গাছের ফল খাইতে নিষেধ করা হইয়াছে। কিন্তু ঐ জাতীয় অন্যান্য গাছের ফলও যে খাইতে পারিব না, এমন নির্দেশ তো দেওয়া হয় নাই। সুতরাং তিনি সেই ফল ভক্ষণ করিলেন।

তিনি যে এজতেহাদ বা গবেষণা করিলেন, ইহাই ভুল করিলেন। তাঁহার উচিত ছিল সতর্ক থাকা এবং জিবরাঈল (আঃ)-এর আসার অপেক্ষায় থাকা যে, তিনি এই সম্বন্ধে আল্লাহর কোন নির্দেশ আমাকে দেন কিনা ? তদুপরি ইহা খাওয়ার এমন কি প্রয়োজনই বা ছিল ? খাওয়ার মত বস্তুর কোন অভাবই তো বেহেশতে ছিল না। সুতরাং ওযর-আপত্তি পেশ করার মত কোন কিছুই তাঁহার ছিল না।

যখন তিনি নিজের রায় মোতাবেক এবং শয়তানের প্ররোচনায় উহা ভক্ষণ করিলেন, তখন তাঁহার যে শ্রেষ্ঠ মর্যাদা ছিল উহা কমিয়া গেল। আদম আল্লাহর

ইচ্ছা পূরণে অক্ষম হইল। শাস্তিস্বরূপ মাথার তাজ ও দেহের আবরণ খুলিয়া লওয়া হইল।

সর্বসাধারণের জন্য শরীরের যে অংশ আবৃত করিয়া রাখার নির্দেশ রহিয়াছে, হযরত আদম (আঃ) শরীরের সেই অংশ কখনও দেখেন নাই। তাঁহার নাভির নিচে এক প্রকার নূর ছিল। কখনও নাভির নিচে দৃষ্টিপাত করিলে সেই নূর নাভির নিম্নাংশ দেখায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিত।

যখন সেই নূরানী পর্দা উঠাইয়া লওয়া হইল তখন তিনি দেহের নিম্নাংশ দেখিতে পাইলেন এবং লজ্জা ও ভয় পাইতে লাগিলেন যে, হয়ত ফেরেশতাগণ আমার এই অনাবৃত দেহাংশ দেখিয়া ফেলিবেন। তখন তিনি ভয় ও লজ্জায় বেহেশতময় দৌড়াদৌড়ি আরম্ভ করিলেন এবং লজ্জা ঢাকার জন্য এই গাছ সেই গাছের নিকট পাতা ভিক্ষা চাহিতে লাগিলেন।

আল্লাহ তখন এরশাদ করিলেন, হে আদম ! তুমি আমার দৃষ্টি হইতে পলায়ন করিয়া ফিরিতেছ ?

আদম (আঃ) আরয করিলেন, প্রভু ! কখনও না। বরং আমি কোন্ শরমে আপনাকে মুখ দেখাইব ?

আল্লাহ নির্দেশ দিলেন, বেহেশত হইতে বাহির হইয়া যাও।

তিনি যখন বেহেশত দ্বারে পৌঁছিলেন, তখন তাঁহার লজ্জা নিবারণ করার জন্য ডুমুর ফলের গাছ পাতা দান করিল।

মোট কথা, হযরত আদম (আঃ)-কে সরন্দ্বীপ এবং হযরত হাওয়া (আঃ)-কে জেদ্দায় নামাইয়া দেওয়া হইল।

ইমাম যাহেদ (রঃ) বলেন, সরন্দ্বীপ এবং জেদ্দার মধ্যে দূরত্ব চৌদ্দ শত মাইল। অতঃপর এই দুনিয়াই হইল তাঁহাদের আবাসভূমি। আল্লাহ তাআলা বলেন, পৃথিবী তোমাদের বাসস্থান। এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তোমাদের জন্য পৃথিবীতে আশ্রয় নিহিত রহিয়াছে। অতঃপর পৃথিবীর রীতিনীতি মোতাবেক কাজ আরম্ভ হইল। পার্থিব রাজা-বাদশাহদের নিয়ম হইল, যখন কোন বাদশাহর কর্মচারী অন্যায় করে তখন তাহাকে সম্মুখ হইতে দূর করিয়া দিয়া বন্দীখানায় পাঠাইয়া দেন। তাই যখন হযরত আদম (আঃ) ভুল করিলেন, তখন আল্লাহ তাঁহাকে শাস্তি দেওয়ার

islamibookbd.wordpress.com

মানসে কয়েদখানাস্বরূপ পৃথিবীতে পাঠাইয়া দিলেন।

এই পৃথিবী মোমেনদের জন্য বন্দীশালা এবং কাফেরদের জন্য জান্নাত। এদিকে ইঙ্গিত করিয়াই কোন বুযুর্গ বলিয়াছেন–

দৈত্য-দানব ও শয়তানের জন্য এই পৃথিবী আবাসগৃহ। দোস্ত ও মোমেনদের জন্য বন্দীখানা। মোমেনদের জন্য পৃথিবীর এই সমস্ত বস্তু রাখিয়াছেন যাহাতে তাহারা দুনিয়ার প্রয়োজন মনে না করে। দুনিয়ার নেয়ামতকেও যেন অগ্রাহ্য করিয়া চলে। আল্লাহ যেন তোমাদিগকে এই সমস্ত চিন্তা-ভাবনা হইতে নিরাপদ রাখেন।

তৃতীয় মজলিস

এলম ও আমল

আটাশে সফর শনিবার। দরবার শরীফে এলম ও আমল সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা হইতেছিল

হযরত পীর ও মুরশিদ বলিলেন, কেহ যদি এলম সম্বন্ধীয় প্রশ্ন করে তবে প্রশ্নকারীর অবস্থা এবং হাল-হাকীকত অনুযায়ী উত্তর দিতে হয়।

এই প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন, এক ব্যক্তি খুব মূল্যবান পোশাক পরিধান করিয়া এক বুযুর্গের দরবারে উপস্থিত হইল এবং প্রশ্ন করিল, বৈরাগ্য কি ? এই ব্যক্তি ধন-সম্পত্তির প্রতি প্রবল আসক্ত ছিল।

বুযুর্গ তাহার ধর্মীয় উপকারিতার প্রতি লক্ষ্য করিয়া উত্তর দিলেন, ধন-সম্পদের মায়া পরিত্যাগ করাকেই যোহদ বা বৈরাগ্য বলা হয়।

উত্তরদানকারীর কর্তব্য প্রশ্নকারীর অবস্থা ও বুঝ-ব্যবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া উত্তর দেওয়া, যাহাতে প্রশ্নকারী সহজে বুঝিয়া উপকৃত হইতে পারে। হুযুর (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, উদ্দেশিত ব্যক্তির বুদ্ধিমত্তার পরিমাপে কথা বল। এই প্রসঙ্গে কোন বুযুর্গ বলিয়াছেন, লোকের বুদ্ধিমত্তা অনুযায়ী কথা বলিব যাহাতে তাহারা আমার কথা বুঝিতে পারে।

কোন লোক কোন বুযুর্গের নিকট প্রশ্ন করিলে বুযুর্গ যদি স্বীয় বুদ্ধিমত্তা অনুযায়ী উত্তর দেন তবে প্রশ্নকারী তাহা দ্বারা কোন প্রকার উপকৃত হয় না। উত্তরদাতার কর্তব্য প্রশ্নকারীকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যে, তাহার কথার উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন আছে কিনা ? যদি উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় তবে তাহার বুঝশক্তি মোতাবেক উত্তর দিবে। আর যদি যদি মনে হয় যে, প্রশ্নকারীর প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার কোন প্রয়োজন নাই, তবে উত্তর দিবে না। বরং টালবাহানা করিয়া এড়াইয়া যাইবে। কারণ, তাহার প্রশ্ন অবান্তর : ধর্মের প্রতি তাহার কোন আসক্তি নাই। ধর্মের সন্ধান করা, যাহা তাহার পক্ষে ফরয, সে তাহা পরিত্যাগ করিয়াছে ; অযথা প্রশ্ন করিয়া সময় নষ্ট করিতে আসিয়াছে।

islamibookbd.wordpress.com

বর্ণিত আছে, একবার এক গ্রাম্য আরব হুযুর (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হইয়া বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমাকে গুরুত্বপূর্ণ এলম শিখাইয়া দিন।

হুযুর (সাঃ) তাহার দিকে তাকাইয়া বুঝিলেন, প্রশ্নকারী যে প্রশ্ন করিয়াছে সে তাহা বুঝে নাই। তাই তিনি তাহাকে এরশাদ করিলেন, মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও।

অতঃপর পীর ও মুরশিদ বলিলেন এই যুগে এমন লোকও আছে যাহারা ফরয ওয়াজিব, সুন্নত ও মুস্তাহাব আদায় করে না, কিন্তু ধুমধামের সাথে হজ্জ করিতে যায়। অথচ হজ্জ করা ফরয হওয়ার কোন শর্তই তাহাদের মধ্যে পাওয়া যায় না।

আবার এমন বহু লোকও আছে যাহারা বাপ-মায়ের হুকুম ব্যতীতই বিদেশ ভ্রমণে বাহির হয় এবং অহংকারের সহিত বলে আমি এমন এমন বস্তু দেখিয়াছি এতবার বিদেশ ভ্রমণ করিয়াছি, অমুক অমুক বুযুর্গের সাক্ষাত লাভ করিয়াছি অমুক বড় বড় খানকায় গিয়াছি। এই জাতীয় সমস্ত সফরই হারাম।

তারপর বলিলেন, সফর চারি প্রকার।

প্রথম প্রকার হজ্জের সফর। যদি হজ্জের জন্য আর্থিক সামর্থ্য এবং রাস্তা বিপদমুক্ত থাকে তবে হজ্জ করা ফরয হয়। যেমন– আল্লাহ তাআলা বলেন,

যেব্যক্তি পথ খরচে সক্ষম তাহার পক্ষে আল্লাহর ঘরের হজ্জ করা ফযর।

দ্বিতীয় সফর হুযুর (সাঃ)-এর রওযা যিয়ারত করার মানসে মদীনা শরীফ গমন করা।

তৃতীয় সফর বায়তুল মোকাদ্দাস যিয়ারতের জন্য গমন করা।

চতুর্থ সফর ধর্মীয় জ্ঞানার্জনের জন্য বিদেশযাত্রা।

নিজের দেশে যদি ধর্মীয় জ্ঞানার্জনের কোন প্রকার সুযোগ-সুবিধা না থাকে তবে অন্যত্র যাওয়া যায়। কেননা, হুযুর (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর উপর ফরয।

আর এক হাদীসে বর্ণিত আছে, চীন দেশে গিয়া হইলেও এলম শিক্ষা কর।

এক বন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন কোন বুযুর্গ জুমআর নামাযে উপস্থিত হন না, ইহার কারণ কি এবং ইহার রহস্য কোথায় ?

তিনি উত্তরে বলিলেন, কোন কোন বুযুর্গ নির্জনতা অবলম্বন করিয়া এক বিশেষ

অবস্থার মধ্যে থাকেন। নির্জনতায় থাকিয়া সেই বিশেষ অবস্থার রক্ষণাবেক্ষণ করেন। জুমআর জামাআতে উপস্থিত না হওয়ায় তাঁহাদের আসলে কোন প্রকার ক্ষতি হয় না। ফলে তাঁহারা উপকার ও অপকারের প্রতি লক্ষ্য রাখেন। যে কাজে বেশী উপকার দেখেন তাহাই অবলম্বন করেন। মসজিদে যাওয়া-আসা করিলে বহু লোকের সাথে মেলামেশা করিতে হয়। ইহাতে তাঁহাদের সময়ের অপচয় হয়। উপকারের চেয়ে অপকারই বেশী হয়। তাই তাঁহারা মসজিদে যাওয়া-আসা পরিত্যাগ করেন।

কিন্তু যে সমস্ত অকর্মণ্য লোক এই বিশেষ অবস্থায় না পৌঁছিয়া ঐ অবস্থার দাবী করত জুমআ ও জামাআত পরিত্যাগ করে এবং কোন স্বার্থসিদ্ধির মানসে নির্জনতা অবলম্বন করিয়া নিজের মর্যাদা বুযুর্গদের মর্যাদার সমতুল্য করিতে চায়, তাহাদের মত দুর্ভাগা আর কে আছে ? তাহারা গোমরাহ–পথভ্রষ্ট।

আবার কোন কোন বুযুর্গ বয়সের আধিক্য এবং দুর্বলতার জন্যও জুমআ এবং জামাআতে যাইতে অক্ষম থাকেন। এই দুর্বলতা ও অক্ষমতা শরীয়তের দৃষ্টিতে মার্জনীয়। যদিও তাঁহারা ইশারায় অনেক কিছু করার ক্ষমতা রাখেন তথাপি তাঁহারা অক্ষম। এই জন্যই তাঁহারা মসজিদে উপস্থিত হন না।

আবার কোন কোন বুযুর্গ আল্লাহর ধ্যানে ডুবিয়া থাকেন। এই ডুবিয়া থাকাতে তাঁহারা অনেক উপকার মনে করেন। মসজিদে যাওয়া আসা এবং সেখানে লোকের সাথে মেলামেশা করিয়া সময় নষ্ট করা এই ডুবিয়া থাকার পক্ষে ক্ষতিকর মনে করেন। এই সমস্ত ধ্যানমগ্ন লোকদের উদ্দেশেই হুযুর (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহর সাথে যাহার মধুর সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে, লোকের সাথে মেলামেশা করিতে সে ভয় পায়।

কিন্তু প্রকৃত কথা হইল, যে আরেফ মসজিদে উপস্থিত থাকিয়া ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নত আদায় করেন সেই আরেফকেই পরিপূর্ণ নিরাপদ বলিব। কারণ, তরীকতের উপর শরীয়ত মোতাবেক আমল করাই কর্তব্য এবং উভয়ের মধ্যে কোন প্রকার তারতম্য আসিতে না দেওয়াই উচিত।

তারপর তিনি এরশাদ করিলেন, বুযুর্গদের নীতি হইল, মতবিরোধযুক্ত মাসআলার যে দিকটা কঠিন সেই দিকটাই তাঁহারা অবলম্বন করেন এবং সেই মতেই নফসকে চলার নির্দেশ দেন। কারণ, ইহাতে নফসের কৃচ্ছ্র সাধন হয়।

islamibookbd.wordpress.com

প্রতিটি সাধারণ লোক যে তাঁহাদের অসাধারণ বাণীর অনুসরণ করে, তুমি মনে রাখিও, তাহাতে আসলে বহু দোষ আছে। কারণ, তাহার নফস তৃপ্তি ও সহজ পন্থার সন্ধানী এবং নফসের খুশীমত ঠিকভাবে এবাদত হয় না।

এক বন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন, যখন হইতে আমি এই হাদীস "দুই জামা বিশিষ্ট লোকের ঈমানে স্বাদ নাই" দেখিলাম, তখন হইতেই আমার মনে কেমন যেন খটকা লাগিয়া রহিয়াছে। এই হাদীসের অর্থ কি ? পীর ও মুরশিদ বলিলেন, এই হাদীসের ব্যাখ্যা মতে দুই স্ত্রীওয়ালা লোক ঈমানের স্বাদ পায় না।

তারপর বলিলেন, অধিক বিবাহ করা উচিত নহে। কারণ, অধিক বিবাহের ফলে পুরুষ বিপদাপন্ন হয়। হুযুর (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, পরিবারের সংখ্যাধিক্য এবং সম্পদের অপ্রাচুর্য লোকের পক্ষে অবমাননাকর।

প্রকৃতপক্ষে দুই জামার অধিকারী শব্দটির আরও সুন্দর একটি অর্থ আছে। অর্থাৎ, যেব্যক্তি দুই জামার অধিকারী, তাহার চেয়ে এক জামার মালিক অধিক সংসারবিরাগী। আর যেব্যক্তি সংসারবিরাগী নহে সে ঈমানের স্বাদ কিভাবে পাইতে পারে ?

যে বস্তু তোমাকে বন্ধু হইতে দূরে রাখে তাহা খারাপ। আর যে বস্তু তোমাকে বন্ধুর নৈকট্যলাভে সহায়তা করে তাহা খুবই ভাল। তাই এক বুযুর্গ কি সুন্দর বলিয়াছেন, তুমি দুনিয়াতেই দুনিয়ার আসক্তি ত্যাগ কর। এরূপ করিলেই তুমি আল্লাহর সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে। আমার ও আল্লাহর মধ্যে ইহাই অন্তরায়। ইহাই সত্য অনুধাবন করা। ইহাই সঠিক পথ।

চতুর্থ মজলিস

সুলুক এবং আহলে সুলুক

উনত্রিশে সফর, রবিবার। উপস্থিত মুরীদ ও ভক্তদের উদ্দেশে হুজ্জাতুল ইসলাম পীরে কামেল হযরত গাযযালী (রঃ) এরশাদ করিলেন, যাহারা আপাদমস্তক মহব্বতে ডুবিয়া থাকেন তাহারাই সালেক। এমন কোন মুহূর্ত খালি যায় না যেই মুহূর্তে মহব্বতের জগত হইতে তাহাদের উপর প্রেমের বারিধারা বর্ষিত না হয়। আর যাহার উপর আলমে আসরার (রহস্যজগত) হইতে প্রতিক্ষণে হাজার অবস্থার সৃষ্টি হয় আর তিনি মত্ততার জগতে এমনভাবে বিভোর থাকেন যে, তাঁহার বুকের উপর যদি আঠার হাজার আলম চাপাইয়া দেওয়া হয় তবুও তিনি উহার খবর রাখেন না ; এমন ব্যক্তিকেই আরেফ বলা হয়।

অতঃপর বলিলেন, আমি একবার সমরকন্দে এমন একজন বুযুর্গকে দেখি যিনি বিস্ময়ের জগতে ডুবিয়া রহিয়াছেন। আমি লোকের নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম, কত বৎসর যাবত তিনি এই অবস্থায় আছেন ? তাহারা বলিল, বিশ বৎসর যাবত আমরা তাঁহাকে একই অবস্থায় দেখিতেছি। যাহা হউক, আমি বেশ কিছুদিন তাঁহার নিকট রহিলাম। এক সময় আমি তাঁহাকে আলমে ছোহওতে অর্থাৎ হুশের অবস্থায় পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কতদিন যাবত আপনি এই অবস্থায় আছেন ? কেহ আপনার নিকট আসা যাওয়া করিলে আপনি অবগত হইতে পারেন কিনা ?

তিনি বলিলেন, ওহে নাদান ! দরবেশ যখন প্রেম জগতে নিমজ্জিত থাকেন এবং তাহার উপর রহস্যের জ্যোতি প্রকাশ পাইতে থাকে তখন তাহার কোন কিছুর খবরই থাকে না। এই অবস্থায় যদি তাহাকে টুকরা টুকরা করিয়াও ফেলা হয় তবু তিনি কিছুই বুঝিতে পারেন না।

দরবেশগণ ! এই পথ তো জীবনবাজি লাগানোর পথ। যে এই পথে পা রাখিয়াছে সে জীবন লইয়া ফিরিতে পারে নাই। হযরত ইয়াহ্ইয়া (আঃ)-এর গলায় যখন শত্রুগণ ছুরি চালাইতে আরম্ভ করে, তখন তিনি ফরিয়াদ করার মনস্থ করেন প্রত্যাদেশ আসিল ইয়াহ্ইয়া ! তুমি যদি একটুও আহ্-উহ্ কর তবে আমার

islamibookbd.wordpress.com

বন্ধুদের তালিকা হইতে তোমার নাম কাটিয়া দেওয়া হইবে। তেমনি যখন হযরত যাকারিয়া (আঃ)-এর মাথায় করাত চলা আরম্ভ করিল, তখন তিনি ফরিয়াদ করিতে মনস্থ করেন। এমন সময় হযরত জিবরাঈল (আঃ) আগমন করিয়া বলিলেন, আল্লাহ বলিয়াছেন, এই সময় যদি তোমার মুখ হইতে দুঃখ-যাতনাসূচক কোন একটি শব্দও বাহির হয়, তবে পয়গম্বরদের দপ্তর হইতে তোমার নাম খারিজ করিয়া দেওয়া হইবে।

অতঃপর তিনি অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে বলিলেন, যে কেহ মহব্বতের দাবী করত বালা-মসিবতে পড়িয়া আল্লাহর দরবারে সহনশক্তি দাবী করে, সে সত্যিকারের প্রেমিক নহে। বরং সে তাহার দাবীতে মিথ্যাবাদী।

বন্ধুর পক্ষ হইতে যতই বিপদাপদই আসুক না কেন, তাহাতে যে ধৈর্যধারণ করে এবং বারংবার শুকরিয়া আদায় করে সে-ই যথার্থ বন্ধু। বন্ধুর দাবীতে সে সত্যবাদী এবং সাথে সাথে এই কথাও বলে যে, এই বাহানায় তিনি আমাকে স্মরণ করিয়াছেন। হযরত রাবেয়া বসরীর উপর যেদিন কোন বিপদাপদ হইত সেদিন তিনি আনন্দ গদগদ কণ্ঠে বলিতেন আজ আমার মাহবুব এই দুর্বলাকে স্মরণ করিয়াছেন। আর যেদিন তিনি বিপদমুক্ত থাকিতেন সেদিন খুব কাঁদিতেন আর বলিতেন, আজ আমি এমন কি অন্যায় করিলাম যেজন্য আমার বন্ধু আমাকে স্মরণ করেন নাই।

বন্ধুগণ ! সলুকুপন্থী হইল ঐ ব্যক্তি যে প্রেম-মহব্বতের দাবী করে, আর যে প্রেমিক হওয়ার দাবী করে এবং বন্ধুর দেওয়া দুঃখ-কষ্ট আনন্দের সাথে গ্রহণ না করে, সে আহলে মারেফাতের নিকট মিথ্যাবাদী।

অতঃপর ময়দানে গায়েব অর্থাৎ অদৃশ্যলোকের কথা উঠিলে পীর ও মুরশিদ এরশাদ করিলেন, যেব্যক্তি পূর্ণতার স্তরে পৌঁছিয়া অকপট অবস্থায় দীর্ঘ দিন সেখানে আছেন তাহাকে অদৃশ্য হইতে আহ্বান করা হয়। ওসমান নামক আমার এক বন্ধু এবং পীর ভাই ছিলেন। তিনি যখন আধ্যাত্মিকতার চরম শিখরে পৌঁছেন তখন এক অদৃশ্য লোক তাঁহার সাথে সাক্ষাত করিয়াছিলেন। একদিন তিনি তাঁহার বন্ধু-বান্ধবের সমাবেশে বসা ছিলেন। আমিও সেখানে ছিলাম। আমরা সকলে শুনিতে পাইলাম কে যেন বলিলেন, হে শায়খ ওসমান। এদিকে আস। আওয়ায পাওয়ার সাথে সাথে তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং যেদিক হইতে আওয়ায আসিতেছিল সেদিকে রওয়ানা হইলেন। মুহূর্তের মধ্যে তিনি আমাদের দৃষ্টির

অন্তরালে চলিয়া গেলেন। ইহার পর আমরা তাঁহার আর কোন সন্ধান পাই নাই।

একবার আমি এবং আমার এক বন্ধু কাবার তাওয়াফ করিতেছিলাম। শায়খ ওসমান নামক একজন বুযুর্গের সন্ধান পাইয়া আমরা তাঁহার পিছনে পিছনে চলিলাম। তিনি যেদিকে যাইতেছিলেন আমরাও সেদিকে যাইতেছিলাম। তিনি আমাদের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলেন এবং আমাদের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, আমার পিছনে পিছনে আসিলে কি হইবে ? বরং আমি যাহা কিছু করি তোমরাও তাহা কর। আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, হযরত আপনি কি করেন ? তিনি বলিলেন, আমি প্রত্যেক দিন হাজার বার কোরআন খতম করি।

আমাদের মনে খটকা লাগিল যে, ইহা কিভাবে সম্ভব হইতে পারে। তিনি আমাদের মনের অবস্থা বুঝিতে পারিয়া মাথা উঁচু করিয়া বলিলেন, হাঁ, অক্ষরে অক্ষরে তেলাওয়াত করিয়াই হাজার বার কোরআন খতম করি। আমরা বুঝিতে পারিলাম, যাহা মানুষের বোধগম্যের বাহিরে তাহাই কারামত। হাজার বার কোরআন খতম করা এই বুযুর্গের খাস কারামত ছিল।

অতঃপর মজলিসের আদব সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ হওয়ায় এরশাদ করিলেন, মজলিসের যেখানে স্থান পাইবে সেখানেই বসিবে এবং উহাই তোমার বসার স্থান। একবার হুযুর (সাঃ) সাহাবায়ে কেরাম দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া বসা ছিলেন। এমন সময় সেখানে তিন ব্যক্তি উপস্থিত হইলেন। একজন সেই মজলিসে স্থান পাইয়া বসিলেন। দ্বিতীয়জন স্থান না পাইয়া পিছনে বসিলেন। তৃতীয়জন স্থান না পাইয়া চলিয়া গেলেন। এক মুহূর্ত অতিবাহিত না হইতেই হযরত জিবরাঈল (আঃ) আগমন করিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আল্লাহ তাআলা এরশাদ করিয়াছেন, যেব্যক্তি আসিয়া বৃত্তের মধ্যে স্থান পাইয়া বসিয়াছে আমি তাহাকে আমার আশ্রয়ে স্থান দিয়াছি। আর যে স্থান না পাইয়া লজ্জার সাথে বৃত্তের বাহিরে বসিয়াছে আমিও তাহার নিকট লজ্জিত। পরকালে তাহার কোন অসুবিধা হইবে না। আর যেব্যক্তি স্থান না পাইয়া মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গেল, আমিও তাহার দিক হইতে রহমতের মুখ ফিরাইয়া লইলাম।

সুতরাং মজলিসে উপস্থিত হইয়া যেখানে স্থান পাইবে সেখানেই বসিবে। বৃত্তের মধ্যে স্থান না পাইলে পিছনে বসিবে। কেননা, উহাই অগন্তুকের বসার স্থান। সব সময় বৃত্তের মধ্যে বসার চেষ্টা করিবে না। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে,

islamibookbd.wordpress.com

মজলিসে আগমন করার পর (বৃত্তের মধ্যে স্থান না থাক সত্ত্বেও) যে মধ্যে বসে সে মালউন বা অভিশপ্ত।

অতঃপর পীর ও মুরশিদ মুরীদদের সুধারণা সম্বন্ধে এরশাদ করিলেন যে, একবার এক দরবেশ মিথ্যা অপবাদের দরুন ধৃত হইলেন এবং মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। জল্লাদ তাঁহাকে বধ্যভূমিতে উপস্থিত করিল। নিয়ম ছিল, কেবলামুখী করিয়া হত্যা করিতে হইবে। দরবেশকে যখন কেবলামুখী করা হইল তখন তাঁহার দৃষ্টি তাঁহার পীরের সমাধির উপর পড়িল। দরবেশ তাঁহার পীরের কবরের দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইলেন। জল্লাদ তাঁহাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। দরবেশ বলিলেন, আমার ইচ্ছা, আমি দাঁড়াইয়াছি। তুমি কেন এই সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতেছ ? তোমার কাজ তুমি কর। ইহা লইয়া উভয়ের মধ্যে বাদানুবাদ হইতেছিল। ইত্যবসরে শাহী ফরমান আসিয়া পৌঁছিল, দরবেশকে ছাড়িয়া দাও। পীরের প্রতি সুধারণা পোষণ করার জন্যই আল্লাহ তাঁহাকে মুক্তি দিলেন।

অতএব পীর জীবিত থাকুন বা মৃত্যুবরণ করুন, উভয় অবস্থায় তাঁহাকে সমানভাবে সম্মান প্রদর্শন করিবে , বরং মৃত্যুবরণ করিলে আরও বেশী সম্মান করিবে।

অতঃপর এরশাদ করিলেন, একবার কোন এক প্রখ্যাত ওলী হজ্জ করিতে যান। হজ্জ সমাপন করার পর মক্কার কোন শহরে উপস্থিত হন। সেখানে ঘুরিতে ঘুরিতে একটি গুহায় গিয়া উপস্থিত হন। তিনি বলেন, আমি সেই গুহায় একজন বুযুর্গকে দণ্ডায়মান অবস্থায় দেখিলাম। তাঁহার চক্ষুদ্বয় খোলা অবস্থায় আকাশের দিকে তাকানো। তিনি শুকাইয়া কাঠের ন্যায় হইয়া গিয়াছিলেন।

ওলী বলেন, আমি একমাস পর্যন্ত তাঁহার পাশে রহিলাম। একদিন তিনি বিস্ময়ের জগত হইতে বাস্তব জগতে ফিরিয়া আসিলেন। আমি তাঁহাকে সালাম করিলে তিনি সালামের উত্তর দিয়া বলিলেন, বন্ধু ! তুমি খুব কষ্ট স্বীকার করিয়াছ। আল্লাহ তোমাকে এই কষ্টের প্রতিদান দিবেন। কেননা, আহলে সাফা বলেন, যেব্যক্তি দরবেশদের খেদমত করে, আল্লাহ তাহাকে উচ্চ মর্যাদা দান করেন।

অতঃপর তিনি আমাকে পাশে বসাইয়া বলিলেন, আমি শায়খ মুহাম্মদ আসলাম তুসীর বংশধর। ত্রিশ বৎসর যাবত আমি এই বিস্ময়ের জগতে ডুবিয়া রহিয়াছি।

দিন-রাত কখন হয় কিছুই বলিতে পারি না। তোমার জন্য আল্লাহ আজ আমাকে এই বাস্তব জগতে ফিরাইয়া দিয়াছেন।

বন্ধু, তুমি ফিরিয়া যাও ! আল্লাহ এই কষ্টের প্রতিদান অবশ্যই তোমাকে দান করিবেন। স্মরণ রাখিও, তুমি যখন এই পথে পা রাখিয়াছ, তখন পৃথিবী ও পার্থিব বস্তুর প্রতি কখনও আকৃষ্ট হইও না, লোক সংস্রব পরিহার করিয়া চলিও। তুমি যাহা কিছু উপার্জন করিবে বা উপঢৌকন হিসাবে পাইবে, উহা কখনও সঞ্চয় করিয়া রাখিবে না ; দান করিয়া দিবে। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন কিছুর প্রতি আকৃষ্ট হইলে কষ্ট পাইবে। এই কথা বলিয়াই তিনি আবার বিস্ময়ের জগতে ডুবিয়া গেলেন।

islamibookbd.wordpress.com

পঞ্চম মজলিস

সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য

তৃতীয় রবিউল আউয়াল, বুধবার। হযরত পীর ও মুরশিদ জামে মসজিদে বহু লোকের সমাবেশে উপবিষ্ট ছিলেন। এই জনতার মধ্য হইতে এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া বলিলেন, আমার ইচ্ছা আমি হুযুরের দাসদের একজন হিসাবে পরিগণিত হই। কয়েকবার তিনি এই কথা বলার পর পীর ও মুরশিদ তাহাকে বায়আত করিলেন। অতঃপর সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য সম্বন্ধে কথাবার্তা আরম্ভ হইল। এক বন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রত্যেক লোকের জন্যই কি সৌভাগ্য অথবা দুর্ভাগ্য লিখিত হইয়াছে।

মাখদুম জাঁহা উত্তর দিলেন, প্রত্যেক ব্যক্তির সৌভাগ্য তাহার মায়ের গর্ভে থাকাকালীন অবস্থায় নির্ধারিত করা হইয়াছে। যতক্ষণ পর্যন্ত সেই সৌভাগ্য তাহার পক্ষে না বর্তায় ততক্ষণ পর্যন্ত সে শান্তি পায় না। যাহার ভাগ্যে দুর্ভাগ্য লিখিত রহিয়াছে তাহা মায়ের উদরে থাকা অবস্থায়ই লিখিত হইয়াছে। এই হতভাগ্যের দুর্ভাগ্য আলেমদের এলম এবং চিকিৎসকদের চিকিৎসায় কখনও দূর হইতে পারে না।

হুযুর আকরাম (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন ঃ মায়ের উদরে থাকাকালীন যাহাকে ভাগ্যবান করা হইয়াছে সে-ই ভাগ্যবান। পক্ষান্তরে মায়ের উদরে যাহাকে দুর্ভাগা লেখা হইয়াছে সে-ই দুর্ভাগা।

আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা সৌভাগ্যশালী এবং যাহাকে ইচ্ছা দুর্ভাগা করিয়া রাখিয়াছেন। যেমন, আল্লাহ তাআলা এরশাদ করিয়াছেন, "আমি তোমাদের কিসমত তোমাদের মধ্যে বণ্টন করিয়া রাখিয়াছি।"

যে পরিমাণ নেকী যেব্যক্তির জন্য নির্ধারণ করা হইয়াছে উহা তাহার দ্বারা কার্যকরী হয় এবং উহা করার জন্য সে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ থাকে। তাহার প্রতিটি কাজ ও কথায় নেকী প্রকাশ পায় ; সমস্ত অন্যায়-অত্যাচার তাহার নিকট হইতে দূর হইয়া যায়। সে তাহার সৌভাগ্যের প্রতিদান দিতে থাকে। অর্থাৎ পুণ্যের কাজে আত্মনিয়োগ করে।

তারপর বলিলেন, আবার এমনও দেখা গিয়াছে যে, বহু লোক নিজেকে পাপী এবং দুর্ভাগ্য বলিয়া মনে করে। ইহা জানা সত্ত্বেও দৃঢ়তার সাথে ভাল হওয়ার জন্য উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়া যায় যেন সে তাহার লক্ষ্যস্থলে পৌছিতে পারে। অর্থাৎ, সে আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হওয়ার মানসে কোন কামেল পীরের নিকট আত্মসমর্পণ করে। ইহার প্রতি ইঙ্গিত করিয়াই বলা হইয়াছে ঃ

অক্ষম পিঁপড়া কাবায় পৌছার চিন্তায় বিভোর। পরিশেষে সে কবুতরের পায়ে জড়াইয়া পড়িল। ফলে সে উহার লক্ষ্যস্থল কাবায় গিয়া পৌছিল।

অতঃপর বলিলেন, আল্লাহ তাআলা অনাদিকালেই বান্দার এই সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য নির্ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন। আর ইহাও কেহ দৃঢ়তার সাথে বলিতে পারে না, কে নেকবখত আর কে বদবখত। তবে পুণ্যের কাজ করা, সৎ পথে চলা নেকবখতীর এবং শরীয়তের বিরোধিতা করা, পাপে আত্মনিয়োগ করা বদবখতীর লক্ষণ

তারপর বলিলেন, এমন বহু লোক আছে, পবিত্র মক্কা শরীফে বসবাস করা সত্ত্বেও কোন দিন তাহারা কাবার যিয়ারত করে নাই বা কোন বৎসর হজ্জও করে নাই। কারণ, এই পবিত্র কাজ করা তাহাদের ভাগ্যে লিখিত নাই। তাই তাহারা এই কাজ করার চিন্তাও করে না। ইহারা কাবার মান-মর্যাদা কি অবগত হইতে পারে ? হে কাবা ! তুমি আমার নিকটবর্তী ! অথচ আমি তোমার প্রতি উদাসীন। সত্য বলিতে কি, এই জাতীয় মক্কাবাসী কাবার মর্যাদা কি বুঝিবে ?

দুনিয়ায় বহু লোক অধিক আগ্রহের সাথে কাবার যিয়ারত করার জন্য রওয়ানা হন। এই সমস্ত আগ্রহী লোকদের মধ্যে কেহ কেহ মক্কা শরীফে পৌছিয়া কাবার দর্শন লাভ করত ধন্য হন। আবার কেহ বা পথিমধ্যেই ইনতেকাল করেন। যাহারা পথিমধ্যে ইনতেকাল করেন, প্রতি বৎসর তাহাদের নামে একটি করিয়া কবুল হজ্জ লিখিত হইয়া থাকে।

হে কাবার অধিপতি ! আমাকেও ঐ সমস্ত লোকের মত পথিক মনে করিয়া গ্রহণ করার যোগ্যতা দান কর। আমি হজ্জ করি নাই বটে, কিন্তু ঐ পথে চলিয়াছি।

অতঃপর বলিলেন, হযুর (সাঃ)-এর যুগে মদীনা শরীফে চারিশত মোনাফেক ছিল। সাহাবায়ে কেরাম অনেক কাজ সুসম্পন্ন করিতেই তাহাদের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হইতেন। এই কারণে তাঁহারা দুঃখিত এবং মনঃক্ষুণ্ন থাকিতেন।

islamibookbd.wordpress.com

দ্বীনে মুহাম্মদী প্রচার করার মানসে যখনই সাহাবাগণ কাফেরদের সাথে জিহাদ করার প্রস্তুতি গ্রহণ করিতেন, তখনই এই সমস্ত মোনাফেক গোপনে কাফেরদিগকে সংবাদ পরিবেশন করিত। সাহাবায়ে কেরাম যখন এই অবস্থা বুঝিতে পারিলেন, তখন পশ্চিম দিকে যুদ্ধ করার হইলে পূর্ব দিকে রওয়ানা হইতেন। দুই তিন মনযিল পূর্ব দিকে চলার পর আবার গন্তব্যস্থল পশ্চিম দিকে রওয়ানা হইতেন। সাহাবায়ে কেরামের এই অবস্থা দেখিয়া মোনাফেকরা হতভম্ব হইয়া যাইত এবং যথার্থ খবর পরিবেশন করিতে সক্ষম হইত না।

বাদশাহের জন্য এরূপ জঙ্গী চাল সুন্নত। সাহাবায়ে কেরাম যে কাজ করার মনস্থ করিতেন, মোনাফেকরা সেই কাজের ক্ষতি সাধন করার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া যাইত। সাহাবায়ে কেরামের কাজ এই কারণেই কাফেরদের নিকট আর গোপন থাকিত না। অথচ এই মোনাফেকরা প্রকাশ্যে জামাআতের সাথে নামায পড়িত, রমযানের রোযা রাখিত আর প্রত্যেকেই বলিত ; আমি একজন মুসলমান। পবিত্র কোরআন ইহাদের সম্বন্ধে বলে ঃ মোমেনদের সাথে সাক্ষাত হইলে তাহারা বলে আমরাও মোমেন। আর যখন শয়তানের নেতার সাথে মিলিত হয়, তখন বলে, আমরা তো মুসলমানদের সাথে ঠাট্টা করি।

কোরআনে ইহাদের সম্বন্ধে কঠোর আযাবের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

إِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ *

নিশ্চয় মোনাফেক সম্প্রদায় অগ্নির শেষ স্তরে থাকিবে।

আর এক বন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন, মানুষের মধ্যে যেমন নেকবখত ও বদবখত আছে, তেমনি মাটিও বদবখত ও নেকবখত হয় নাকি ?

হযরত পীর ও মুরশিদ বলিলেন, মাটিও নেকবখত এবং বদবখত হয়। যে মাটি উর্বর, সে মাটির গাছ প্রচুর পরিমাণে ফসল দেয়, যে মাটি প্রচুর পরিমাণে ফলস দেয় সেই মাটি নেকবখত। আর যে মাটি অনুর্বর, ফসল দেয় না, উহা বদবখত। নেকবখত ও বদবখত সমস্ত সৃষ্টির মধ্যেই আছে।

মোটকথা, আল্লাহ যাহাকে নেকবখত বা ভাগ্যবান করিয়াছেন সে শয়তানের ফাঁদে পড়িয়া কখনও দুর্ভাগা হইতে পারে না। আর যাহাকে আল্লাহ দুর্ভাগা করিয়াছেন সে দুনিয়ায় ওলীদের চেষ্টায়ও ভাগ্যবান হইতে পারে না।

হুযুর (সাঃ)-এর একান্ত ইচ্ছা ছিল, আবু তালেব ইসলাম গ্রহণ করুন। তিনি বারবার দোআ করিতেন, হে খোদা ! তুমি তাহাকে ইসলাম দান কর। তাঁহার দোআ যখন সীমা অতিক্রম করিয়া গেল, তখন হযরত জিব্রাঈল (আঃ) দোস্তের নিকট হইতে ফরমান লইয়া আসিয়া বলিলেন ঃ আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি চাই সে কাফের থাকুক আর আপনি চাহিতেছেন সে ইসলাম গ্রহণ করুক। হে বন্ধু ! আমার ইচ্ছা সম্বন্ধে আপনার বিবেচনা করা উচিত। সে বদবখত ; কাফেরই থাকিবে। নেকবখতী যখন তাহার ভাগ্যে নাই, তখন সে কিভাবে মোমেন হইবে ?

islamibookbd.wordpress.com

ষষ্ঠ মজলিস

লায়লাতুল রাগায়েব

দরবার শরীফ হইতে এক বন্ধু দাঁড়াইয়া বলিলেন, আগামীকাল জমাদিউল আখের মাসের শেষ দিন বৃহস্পতিবার, দিনে রোযা রাখিয়া রাতে লায়লাতুর রাগায়েব নামায আদায় করিব কিনা?

পীর ও মুরশিদ বলিলেন, কিতাবে লিখিত আছে, রজব মাসের প্রথম বৃহস্পতিবার রোযা রাখিয়া দিনগত রাতে অর্থাৎ রজবের প্রথম শুক্রবারের রাতে লায়লাতুর রাগায়েব নামায পড়িবে। আজ রজব মাসের প্রথম শুক্রবারের রাত নহে। লায়লাতুর রাগায়েব নামায রজব মাসের প্রথম শুক্রবার রাতে পড়িতে হয়। কিন্তু নামায পড়া উচিত এবং আগামী বৃহস্পতিবার রোযা রাখিবে। সতর্কতা অবলম্বনস্বরূপ আগামী শুক্রবারের রাতেও জামাআতের সাথে লায়লাতুর রাগায়েবের নামায আদায় করিবে।

মাওলানা যাহেদ জিজ্ঞাসা করিলেন, সমস্ত মাস ও দিন আল্লাহর সৃষ্টি। তবে কেন একের উপর অন্যকে মর্যাদা দান করা হইয়াছে?

হযরত পীর সাহেব বলিলেন, এ কথা ঠিক যে, সমস্ত মাস ও দিন আল্লাহর সৃষ্টি। কিন্তু প্রতিটি বস্তুর জন্য মর্যাদা নির্ধারণ করা হইয়াছে যেন তাঁহার বান্দাগণ অধিক পুণ্য অর্জনের মাধ্যমরূপে সেইগুলি ব্যবহার করিতে পারে। তেমনি মানুষের মধ্যে মর্যাদার তারতম্য নির্ণয় করা হইয়াছে। কাহাকেও পয়গম্বর, কাহাকেও ওলী আবার কাহাকেও আলেম করিয়াছেন। অতঃপর পয়গম্বরদের মধ্যে মর্যাদার পার্থক্য রহিয়াছে। কেহ নবী আবার কেহ বা নবী ও রাসূল।

আল্লাহ তাআলা এরশাদ করিয়াছেন–

"এই সমস্ত রাসূলের মধ্যে আমি একের উপর অন্যকে মর্যাদা দান করিয়াছি। তাহাদের মধ্যে কেহ আল্লাহর সাথে কথোপকথন করিয়াছেন। আল্লাহ তাহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও মর্যাদা উন্নত করিয়াছেন।"

কোন পয়গম্বরই আমাদের হুযুর (সাঃ)-এর সমকক্ষ নহেন। আমাদের হুযুর

(সাঃ) যে স্থানে গিয়াছিলেন সে স্থান সম্বন্ধে কোন নবী বা কোন ফেরেশতাই অবগত ছিলেন না। হুযুর (সাঃ) স্বয়ং এই মর্যাদা সম্বন্ধে এরশাদ করিয়াছেন ঃ

আল্লাহর সাথে আমার এমন একটি সময় নির্ধারিত রহিয়াছে যখন কোন ফেরেশতা এবং নবী-রাসূলের স্থান হয় না।

তেমনি ওলীদেরকেও বিভিন্ন প্রকার মর্যাদা দান করা হইয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে কেহ পথপ্রদর্শক, কেহ আশেক আবার কেহ বা পূর্ণ নিরাপদ।

তদ্রূপ মাটিকেও বিভিন্ন প্রকার মর্যাদার অধিকারী করা হইয়াছে। এক মাটিকে কাবা অন্য মাটিকে গির্জা করিয়াছেন। কোন মাটিই কাবার মাটির সমকক্ষ হইতে পারে না। অন্যান্য যাবতীয় কিছুকে ইহার উপরই ধারণা করিয়া লইবে।

আল্লাহ তাআলা সমস্ত সৃষ্টিকেই এইভাবে ভিন্ন ভিন্ন মর্যাদা দান করিয়াছেন। মর্যাদার স্তরবিন্যাস না করা হইলে সমস্ত কিছুই এক সমান হইয়া পড়িত। ইহা হেকমত বিরোধী। এই শ্রেণীবিন্যাস দ্বারাই আল্লাহর সৃষ্টির সৌন্দর্যের উৎকর্ষ সাধন করা হইয়াছে। তুমি কি লক্ষ্য করিয়া দেখ নাই, পৃথিবীর রাজা-বাদশাহরা লোকজনের পদমর্যাদা অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগ করিয়া থাকেন? একজনকে মন্ত্রী আবার অন্য জনকে প্রহরী নিযুক্ত করেন। একজনকে সভাসদ করেন, অন্য জনকে নিকটেও ঘেঁষিতে দেন না। একজনের ধন-সম্পদ কাড়িয়া লইয়া তাহাকে বন্দী করেন আবার আর একজনকে উপাধি ও জায়গীর দিয়া সম্মানিত করেন।

পৃথিবীর বাদশাহই যখন তাহার প্রজাদের মধ্যে এমন শ্রেণীবিভাগ করিতে পারেন, তখন আল্লাহ তাআলার পক্ষে তাঁহার একাধিপত্য ও সৃষ্টির সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার জন্য এমন শ্রেণীবিন্যাস করা তো আরও উপযোগী। এই একচ্ছত্র অধিপতি যে আঠার হাজার মাখলুক সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার প্রত্যেকটির ভিন্ন ভিন্ন মর্যাদা রহিয়াছে। তাহাতে যদি সামান্য পরিমাণেও কম থাকে তবে তাঁহার রাজত্বে খুঁত থাকিয়া যাইবে এবং সৌন্দর্যের হানি হইবে। তিনি জ্ঞানী ও হাকীম। সুতরাং তাঁহার প্রতিটি কাজ সুশৃঙ্খল। তাহাতে কোন প্রকার খুঁত নাই।

যেমন– কোন শহরে যদি তাঁতী না থাকে তবে ঐ শহরের সৌন্দর্যে ঘাটতি দেখা দিবে। কারণ, কাপড়ের অভাবে লোক উলঙ্গ থাকিবে এবং শীত-তাপ হইতে আত্মরক্ষায় অপারগ হইয়া পড়িবে।

islamibookbd.wordpress.com

বাদশাহর পক্ষে যেমন দানশীল হওয়া দরকার তেমনি কৃপণতা করাও দরকার। রূঢ় ব্যবহার করার সাথে সাথে তাহাকে দয়াপরবশও হইতে হইবে। কারণ, রাষ্ট্র টিকাইয়া রাখারা জন্য একজন বাদশাহর মধ্যে এই সমস্ত গুণ থাকা একান্ত প্রয়োজন।

এই প্রসঙ্গে তিনি একটি কাহিনী বলিলেন যে, শামসুদ্দীন কাদীম নামে এক বাদশাহ ছিলেন। তাহার প্রধানমন্ত্রীর নাম ছিল আরসালান।

একদিন বাদশাহ মন্ত্রীকে ডাকিয়া বলিলেন, তোমাকে আমার একটি বিষয় জিজ্ঞাস্য আছে, যদি সঠিক উত্তর দাও তবে জিজ্ঞাসা করি।

মন্ত্রী বলিলেন, বলুন ! আমি সঠিক উত্তরই দিব। বাদশাহ বলিলেন, আমার দুই পুত্র। প্রথম পুত্র হাতেম একটি প্রদেশের শাসনকর্তা। দ্বিতীয় পুত্র আযম অন্য দেশের শাসনকর্তা। এখন বল, দুই ভাইয়ের মধ্যে বাদশাহী করার উপযুক্ত কে ?

মন্ত্রী বলিলেন, আপনি সঠিক উত্তর দিতে বলিয়াছেন, আমি তাহাই দিব। দুই ভাইয়ের একজনও রাষ্ট্র পরিচালনা করার উপযুক্ত নহে।

বাদশাহ মন্ত্রীর কথা শুনিয়া মনঃক্ষুণ্ন হইলেন। তথাপি জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন উপযুক্ত নহে ?

মন্ত্রী বলিলেন, হাতেম সহনশীল এবং দয়ালু। আযম দাম্ভিক, অত্যাচারী এবং খামখেয়ালী স্বভাবের।

দুই ভাই দুই প্রকার চরিত্রের অধিকারী। অথচ রাষ্ট্র পরিচালনা করার জন্য উভয়বিধ গুণের সমাবেশ থাকিতে হইবে। উভয়ের মধ্যেই খুঁত রহিয়াছে। সুতরাং কেহই বাদশাহ হওয়ার উপযুক্ত নহে।

অতঃপর পীর ও মুরশিদ বলিলেন, মন্ত্রী যাহা বলিয়াছিলেন পরিশেষে তাহাই সঠিক প্রমাণিত হইল।

কিছুদিন পর বাদশাহ শামসুদ্দীন কাদীম মারা যান। হাতেম ও আযম তাহাদের স্ব স্ব এলাকার বাদশাহ হইলেন। হাতেম তাহার দয়াপরবশতার জন্য রাজ্য ধ্বংস করিয়া দিলেন। অপরপক্ষে আযমের অত্যাচার-উৎপীড়নের দরুন তাহাকে সিংহাসনচ্যুত করা হইল। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, রাষ্ট্র পরিচালনা করার জন্য উভয়বিধ গুণের প্রয়োজন। অন্যথায় শাসনক্ষমতা হইতে সরিয়া দাঁড়াইতে হয়।

তারপর মাওলানা যাহেদ জিজ্ঞাসা করিলেন, যদি এই আঠার হাজার আলমের মধ্যে কোন একটি আলম ধ্বংস হইয়া যায়, তবে তাঁহার খোদায়ীর মধ্যে কোন প্রকার তারতম্য দেখা দিবে কিনা ?

পীর ও মুরশিদ উত্তর দিলেন, সমস্ত সৃষ্টিও যদি ধ্বংস হইয়া যায় তথাপি তাঁহার সত্তা ও গুণাবলীর মধ্যে কোন প্রকার পার্থক্য পরিলক্ষিত হইবে না। আর যদি আঠার হাজারের পরিবর্তে লক্ষাধিক মাখলুকও সৃষ্টি করেন তবুও তাঁহার পক্ষে কোন বাড়াবাড়ি হইবে না। আবার ধ্বংস করিয়া দিলেও তাঁহার সত্তা ও গুণাবলী যথাবিহিত স্থায়ী থাকিবে।

কারণ, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সৃষ্টির জন্য, আল্লাহর জন্য নহে। তিনি অনাদি অনন্ত। কিন্তু সৃষ্টি ধ্বংস হইয়া গেলে রাষ্ট্রের বিধি-ব্যবস্থা বানচাল হইয়া পড়ে।

তারপর বলিলেন, আল্লাহ তাআলা কখনও তাঁহার প্রেমিকদের উপর রহমতের ঝর্ণাধারা বর্ষণ করেন আবার কখনও বা ক্রোধের লু হাওয়া প্রবাহিত করেন। কিন্তু তাঁহারা জানেন, ভাল-মন্দ সবই আল্লাহর পক্ষ হইতে। তাই তাঁহারা সুখ-দুঃখ সব কিছুই মধুর ন্যায় আকণ্ঠ পান করেন। যদি তাঁহারা ইহাকে বস্তুবাদীদের ন্যায় অন্যের প্রতি প্রযুক্ত করেন, তবে এই বিপদ গ্রাসে তাঁহারা কোন স্বাদ আনন্দ পান না।

অতঃপর মাওলানা যাহেদ জিজ্ঞাসা করিলেন, এক সত্যের সন্ধানী উদ্দেশ্য সাধনে ব্রতী। সে তাহা কিভাবে অর্জন করিবে ? কারণ, তিনি অনিত্য, ইহা নিত্য, তিনি স্রষ্টা আর ইহা সৃষ্টি। তিনি প্রাচুর্যের মালিক আর ইহা দরিদ্র ! পীর ও মুরশিদ বলিলেন, ইহা সত্য। কিন্তু ইহাও তাঁহার তরফ হইতে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, কুকুর কখনও বাদশাহর দরবারে গিয়া বসিতে পারে না। কিন্তু বাদশাহ যদি কুকুরকে দরবারে যাওয়ার এবং সম্মুখে বসার অনুমতি দেন, তবে তাহা কুকুরের ইচ্ছায় নহে ; বরং বাদশাহর ইচ্ছায় সম্পন্ন হইয়া থাকে।

অতঃপর এক বন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন, মানুষ যখন নিদ্রিত হয়, তখন রূহ দেহ হইতে বাহির হইয়া যায় কিনা ?

এরশাদ করিলেন, রূহ দুইভাবে বাহির হয়। প্রথম প্রকার সম্পূর্ণভাবে, দ্বিতীয় প্রকার আংশিক। সম্পূর্ণরূপে বাহির হইয়া গেলে আর ফিরিয়া আসে না, অর্থাৎ মৃত্যুবরণ করে। আংশিক যেমন– কোন লোকের নিদ্রিত হওয়া। যখন জাগ্রত করে

islamibookbd.wordpress.com

জাগিয়া যায়। কিন্তু নিদ্রিত অবস্থায় সে নিশ্চুপ থাকে। তাহার সম্মুখে কোন কথাবার্তা বলিলেও সে শুনিতে পায় না। এই জন্যই নিদ্রাকে আংশিক মৃত্যু বলে।

হুযুর (সাঃ এরশাদ করিয়াছেন, নিদ্রা মৃত্যুর ভাই।

অন্য এক বন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন, রূহের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে হুযুর (সাঃ) অবগত ছিলেন কিনা ?

এরশাদ করিলেন, হুযুর (সাঃ) যদিও প্রকৃত অবস্থা অবগত ছিলেন তথাপি তাঁহার প্রতি নির্দেশ ছিল, আপনি বলিয়া দিন, "রূহ আল্লাহর এক নির্দেশ।" হয়ত হুযুর (সাঃ)-এর ইচ্ছা ছিল রূহ সম্বন্ধে কিছু বলিবেন। কিন্তু আল্লাহর পক্ষ হইতে দ্বিতীয় নির্দেশ আসিল, "সামান্য জ্ঞান ব্যতীত আপনাকে আর কিছুই দেওয়া হয় নাই।"

বুযুর্গগণ বলেন, আল্লাহর কোন কোন বান্দা রূহের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞাত।

হুযুর (সাঃ) যদি রূহের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞাত ছিলেন তবে তাহাতে বিস্ময়ের কি আছে ? হুযুর (সাঃ) দোআ করিতেন, হে আল্লাহ ! সমস্ত বস্তুর প্রকৃত অবস্থা আমাকে জ্ঞাত করাও। তাঁহার দোআ আল্লাহর নিকট কবুল হইত। তাই রূহের প্রকৃত অবস্থা তিনি জ্ঞাত ছিলেন। কিন্তু বর্ণনা করার আদেশ ছিল না।

কোন কোন বুযুর্গ রূহকে দেহ বলিয়াছেন। কিন্তু তাহা এত সূক্ষ্ম যে, দৃষ্টিগোচর হয় না। আরও বলেন, ফেরেশতাগণও দেহবিশিষ্ট। কিন্তু এত দ্রুত গতিসম্পন্ন যে, পলকের মধ্যে আসমান হইতে যমীনে এবং যমীন হইতে আসমানে উঠানামা করিতে পারেন।

ফেরেশতাদের চলাফেরার প্রয়োজন আছে, রূহের নাই। তাই রূহের কাঠামো ফেরেশতাদের চেয়েও সূক্ষ্ম।

এক বন্ধু বলিলেন, আমি একটি কবিতা দেখিয়াছি যাহার অর্থ নিম্নরূপ ঃ সুন্দর মুখের অধিকারী সর্বক্ষণ ইসলামকে ধ্বংস করে। আমি যখনই কোন সুন্দর মুখের অধিকারী মুসলমানকে দেখিয়াছি তখনই কাফের হইয়া গিয়াছি। ইহার অর্থ কি ?

এরশাদ করিলেন, এমন সব কথার প্রতি মনঃসংযোগ করিতে নাই। কারণ, পাগলের কথায় জ্ঞানবানদের পক্ষে আমল করা ঠিক নহে।

কারণ, খোদা প্রেমিক পাগলগণ এক বিশেষ অবস্থা এবং সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে

কথা বলেন। কিন্তু জ্ঞানবানদের পক্ষে তাহা বলা অন্যায়। আল্লাহ পাগলের ঐ কথাকেই কবুল করিয়া থাকেন।

হযরত মূসা (আঃ)-এর যুগ। দেশে বৃষ্টি নাই, ফসল নাই। মানুষ দুর্ভিক্ষের কবলে পড়িয়া হা-হুতাশ করিতেছে।

সকলে ময়দানে আসিয়া বৃষ্টির জন্য নামায পড়িল, দোআ করিল। কিন্তু বৃষ্টি হইল না।

অবশেষে তাহারা হযরত মূসা (আঃ)-এর নিকট আসিয়া বলিল, আপনি আল্লাহর নবী, যুগের শ্রেষ্ঠ বুযুর্গ। আপনি বৃষ্টির জন্য আল্লাহর নিকট দোআ করুন।

হযরত মূসা (আঃ) হাত উঠাইয়া আল্লাহর দরবারে দোআ করিলেন। আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَاِذِ اسْتَسْقٰى مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ

মূসা যখন তাহার দেশবাসীর জন্য বৃষ্টি কামনা করিল।

আল্লাহ তাআলা প্রত্যাদেশ দিলেন, শহরে চলিয়া যাও এবং বারাখ নামক এক পাগলের সন্ধান কর। সে যদি বৃষ্টির জন্য দোআ করে তবেই বৃষ্টি হইবে।

আল্লাহর নির্দেশমত হযরত মূসা (আঃ) শহরে গেলেন এবং বারাখের সন্ধান করিতে লাগিলেন। অনেক সন্ধান করার পর তাঁহার সাক্ষাত পাইলেন।

হযরত মূসা (আঃ) বলিলেন, বৃষ্টির জন্য আপনি আল্লাহর নিকট দোআ করুন।

বারাখ বলিলেন, আপনি আল্লাহর নবী। আপনি থাকিতে আমি এরূপ ধৃষ্টতা করিতে পারি না।

হযরত মূসা (আঃ) বলিলেন, আল্লাহ নির্দেশ দিয়াছেন, বারাখ দোআ করিলে বৃষ্টি দিব।

বারাখ উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং আকাশের দিকে মুখ করিয়া বলিলেন, কাহার নিকট তুমি এই কৃপণতা শিখিলে ?

এই কথা তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইতে না হইতেই অঝোর ধারায় বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ করিল।

পরদিন হযরত মূসা (আঃ) বারাখের নিকট গেলেন। বারাখ বলিলেন, আপনি

islamibookbd.wordpress.com

লক্ষ্য করিয়াছেন কি, আমি গতকাল আল্লাহকে কি বলিয়াছি ?

অবশ্য পাগলের পাগলামি করা অন্যায় কিছু নহে। তাহার সকল ঔদ্ধত্যই বৈধ। এখানে ভাল-মন্দ সব কিছু বিলুপ্ত হইয়া যায়। তাহার সকল কথাই গ্রহণযোগ্য।

এই প্রসঙ্গে তিনি আর একটি কাহিনী বর্ণনা করিলেন যে, রোম শহরে এক দরবেশ ছিলেন। তাঁহার নাম আবদুল্লাহ ইসহাক। তাঁহার মুরীদ ও ভক্তের দল ছিল অগণিত।

এক রাতে তিনি কিছু বিরক্তির ভাব লইয়া খানকা হইতে বাহির হইয়া এক মন্দিরে প্রবেশ করিলেন এবং নিজের গলায় পৈতা পরিধান করিলেন। মুরীদ ও ভক্তের দল পীর সাহেবের এই অন্যায় কাজ দেখিয়া প্রায় সকলে তাঁহাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল। হাতেগনা কয়েকজন লোকমাত্র তাঁহার সাথে রহিল।

কয়েকদিন পর তাঁহার এক ভক্ত স্বপ্নে দেখিলেন, হুযুর (সাঃ) শহর প্রাচীরের নিকট আগমন করত অতিশয় ক্ষিপ্রতার সাথে শহরে প্রবেশ করিতেছেন।

এই ভক্ত অতি বিনয়ের সাথে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! এত ক্ষিপ্রতার সহিত কোথায় তাশরীফ লইয়া যাইতেছেন ? এরশাদ করিলেন, আবদুল্লাহ ইসহাক আল্লাহর প্রতি খুবই ক্রোধান্বিত হইয়াছে। আমি সন্ধি করানোর জন্য যাইতেছি।

মুরীদ জাগ্রত হইয়া আনন্দের সাথে তখনই মন্দিরের দিকে দৌড় দিলেন। গিয়া দেখেন পীর সাহেব গলার পৈতা দূরে নিক্ষেপ করত সেজদায় পড়িয়া বলিতেছেন ঃ

আমি তওবা করিতেছি, তওবা করিতেছি। হে খোদা ! সন্ধি করিয়া লও, মেহেরবানী কর, ক্ষমা কর।

সপ্তম মজলিস

বেহেশতের উত্তম খাদ্য

দশম রবিউল আউয়াল, বুধবার। আমি পবিত্র দরবারে উপস্থিত ছিলাম। খাদ্যদ্রব্য আনা হইল। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, বেহেশতের উত্তম আহার্য বস্তু কি হইবে ?

এরশাদ করিলেন, বেহেশতের উত্তম আহার্য বস্তু হইল গোশত। তাহার প্রতি গ্রাসে সত্তর প্রকার স্বাদ বিদ্যমান থাকিবে। একটি স্বাদের সাথে অন্যটির কোন প্রকার সামঞ্জস্য থাকিবে না। কিন্তু বেহেশতের গোশত এই পৃথিবীর গোশতের ন্যায় নহে। কারণ পৃথিবীর গোশত নশ্বর আর বেহেশতের গোশত কখনও শেষ হইবে না। সুতরাং উভয়ের মধ্যে অনেক পার্থক্য। তাহা যতই খাওয়া হউক না কেন, শেষ কখনও হইবে না।

যেমন– পৃথিবীতে এক নেয়ামত পবিত্র কোরআন। এই কোরআন যতই তেলাওয়াত করা যায়, যতই বর্ণনা করা এবং শুনা যায়, তাহার স্বাদ কখনও শেষ হয় না বা কোন প্রকার তারতম্য হয় না।

এই সম্বন্ধে একটি কাহিনী বর্ণনা করিলেন যে, হযরত জোনায়েদ বাগদাদী (রঃ)-এর সাথে এক ইহুদীর খুব ভালবাসা ছিল। একদিন ইহুদী তাঁহার নিকট আগমন করিল এবং কিছুক্ষণ অবস্থান করার পর ফিরিয়া যাওয়ার জন্য উঠিল। হযরত জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথায় যাইতেছ ?

ইহুদী বলিল, আজ আমাদের একটি সমাবেশ আছে। সকল ইহুদীই সেখানে উপস্থিত হইবে। আমিও সেখানে যাইব।

হযরত জোনায়েদ (রঃ) বলিলেন, আমাকেও তোমার সাথে লইয়া চল।

ইহুদী বলিল, জনাব ! আপনি সেখানে যাইতে পারিবেন না। কারণ, সেখানে কোন মুসলমানকে দেখিলে সাথে সাথেই ইহুদীরা তাহাকে হত্যা করিয়া ফেলিবে।

হযরত জোনায়েদ বলিলেন, আমি তোমাদের বেশ-ভূষায়ই যাইব।

islamibookbd.wordpress.com

মোটকথা, হযরত জোনায়েদ তাহার সাথে সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, একটি উঁচু আসন তৈয়ার করা হইয়াছে। কিছুক্ষণ পর একজন অতি দুর্বল বৃদ্ধকে সেই আসনে আনিয়া বসান হইল। এই বৃদ্ধ প্রতি বৎসর এখানে বসিয়া উপস্থিত জনতাকে একটি মাত্র উপদেশ দিতেন। তাহারা সকলে তাহার সেই উপদেশ পালন করিত।

কিন্তু এইবার দুর্বল বৃদ্ধ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, একটি কথাও বলিল না। তাহার ভক্তগণও চুপ করিয়া তাহার কথা শুনিবার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। যখন কোন কথাই বৃদ্ধের মুখ দিয়া বাহির হইল না, তখন ভক্তদের মধ্য হইতে কেহ তাহার নিকট গিয়া বলিল, আপনি আজ কিছু বলিতেছেন না কেন ? আমরা সকলেই যে আপনার বাণী শুনার জন্য অধীরভাবে অপেক্ষমাণ। বৃদ্ধ বলিল, এই মজলিসে একজন মুসলমান আছেন, তাই আমি কোন কথা বলিতে পারিতেছি না।

ইহুদীগণ এই কথা শুনিয়া অগ্নিশর্মা হইয়া বলিল, কে সেই মুসলমান ! কোথায় সে ! বলুন, এখনই আমরা তাহাকে হত্যা করিব।

বৃদ্ধ বলিল, না, হত্যা নহে। বরং তোমরা যদি ওয়াদা কর তাঁহাকে হত্যা করিবে না, তবেই আমি তাঁহার সন্ধান দিব।

সকল ইহুদী একবাক্যে হত্যা না করার প্রতিশ্রুতি দিলে বৃদ্ধ বলিল, ঐ ব্যক্তি। তাঁহাকে আমার নিকট লইয়া আস।

হযরত জোনায়েদ (রঃ)-কে বৃদ্ধের নিকট লইয়া আসা হইল। বৃদ্ধ বলিল, আপনি কেন এখানে আসিয়াছেন ?

তিনি বলিলেন, তামাশা দেখার জন্য।

বৃদ্ধ বলিল, আপনি যখন আসিয়াছেন তখন আমার কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দিন।

হযরত জোনায়েদ বলিলেন, আমি যদি তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি তবে তুমি ইসলাম গ্রহণ করিবে কি ?

বৃদ্ধ বলিল, হাঁ ! আমি ওয়াদা করিতেছি যে, আপনি আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিলে আমি অবশ্যই ইসলাম গ্রহণ করিব।

হযরত জোনায়েদ (রঃ) বলিলেন, তুমি প্রশ্নকারী। সুতরাং তুমি আসন হইতে

নামিয়া আস। আমি ঐখানে বসিয়া তোমার প্রশ্নের উত্তর দিব।

বৃদ্ধ আসন হইতে নামিয়া আসিলে তিনি সেই আসনে গিয়া উপবেশন করিলেন।

বৃদ্ধ বলিল, ওহে শায়খ ! আপনাদের ধর্মের তিনটি বিষয় আমার বুঝে আসে না। আপনি যদি উহার উত্তর পৃথিবীর বিষয়বস্তুর উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দিতে পারেন তবে আমি ঈমান আনিয়া মুসলমান হইব।

হযরত জোনায়েদ বলিলেন, প্রশ্ন কর।

ইহুদী বলিল, (১ম) আপনারা বলিয়া থাকেন, বেহেশতে এত পানাহারের পরও পায়খানা-প্রস্রাবের প্রয়োজন হইবে না। (২য়) বেহেশতে এমন একটি বৃক্ষ থাকিবে যাহার শাখা-প্রশাখা বেহেশতের প্রতিটি ঘরের উপর বিস্তার লাভ করিবে এবং (৩য়) বেহেশতের নেয়ামত যতই খাওয়া হউক না কেন তাহার ঘাটতি হইবে না।

ইহা তো অসম্ভব কথা। ইহা কিভাবে সম্ভবপর হইতে পারে ? পার্থিব উদাহরণের সাথে আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিলে আমি ঈমান আনিব।

হযরত জোনায়েদ (রঃ) বলিলেন, তোমার প্রথম প্রশ্নের উদাহরণ এই যে, সন্তান যখন মাতৃগর্ভে থাকে তখন সে পানাহার করে, কিন্তু পায়খানা-প্রস্রাবের প্রয়োজন হয় না।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর হইল, পৃথিবীতে সূর্য একটি। কিন্তু উহার আলো সকল গৃহের উপরই পতিত হয় ; ভিন্ন ভিন্ন দেশের জন্য ভিন্ন ভিন্ন সূর্যের প্রয়োজন হয় না।

তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর হইল, কোরআন শরীফ। অগণিত লোক তাহা তেলাওয়াত করে, শ্রবণ করে এবং তাহা দ্বারা উপকৃত হয়। কিন্তু তাহার স্বাদ ও মাধুর্যে কখনও কোন পরিবর্তন আসে নাই এবং আসিবেও না।

অতঃপর হযরত জোনায়েদ (রঃ) বলিলেন, ওহে বৃদ্ধ ! আমি তোমার তিনটি প্রশ্নের উত্তর দিয়াছি। এখন আমি একটি মাত্র প্রশ্ন করিতেছি, উত্তর দাও ;

বৃদ্ধ বলিল, প্রশ্ন করুন, আমি উত্তর দিব।

হযরত জোনায়েদ বলিলেন, বেহেশতের দরজার উপর কি লেখা রহিয়াছে ?

islamibookbd.wordpress.com

বৃদ্ধ এই প্রশ্ন শুনিয়া চুপ করিয়া রহিল।

ইহুদীগণ সমস্বরে বলিয়া উঠিল, আপনি আমাদের বুযুর্গ এবং ধর্মীয় নেতা। আপনি তিনটি প্রশ্ন করিয়াছেন তিনি উত্তর দিয়াছেন। তিনি একটি মাত্র প্রশ্ন করিয়াছেন, আপনি কেন চুপ করিয়া রহিলেন ? তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিন।

বৃদ্ধ বলিল, আমি যে উত্তর দিব তোমরা যদি তাহা মানিয়া লওয়ার অঙ্গীকার কর তবেই আমি উত্তর দিব। অন্যথায় নহে। তাহারা সকলেই অঙ্গীকার করিল, হাঁ। আমরা আপনার কথায় বিশ্বাস করিয়া অবশ্যই মানিয়া লইব।

বৃদ্ধ বলিল, বেহেশতের দরজার উপর লিখা রহিয়াছে–

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

এই উত্তর শুনিয়া সকলেই কালেমা তাওহীদ পাঠ করত ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিল।

ইহার পর পীর ও মুরশিদ এরশাদ করিলেন, বেহেশতবাসী মনে মনে যে বস্তু পাওয়ার ইচ্ছা করিবে, সাথে সাথেই মেহেরবান আল্লাহ উহা তাহাকে দান করিবেন।

তারপর আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হযরত ! বেহেশতবাসী যদি সেখানে শরীয়ত বিরোধী কোন বস্তু কামনা করে তবে দান করা হইবে কিনা ?

এরশাদ করিলেন, শরীয়ত বিরোধী কোন বস্তুর কথা সেখানে কাহারও মনে উদয়ই হইবে না। বেহেশতবাসী সেখানে যে কাজ করিবে তাহা সবই হইবে প্রশংসনীয়।

তারপর বলিলেন, কোন কোন লোক প্রশ্ন করিয়া থাকে যে, বেহেশতে কোন প্রকার চিন্তা-ভাবনা থাকিবে না– ইহা কি প্রকারে সম্ভবপর হইতে পারে ? বাবা বেহেশতী আর পুত্র দোযখী অথবা পুত্র বেহেশতী এবং বাবা দোযখী হইলে অবশ্যই একে অন্যের জন্য চিন্তা করিবে। সুতরাং বেহেশতে চিন্তা-ভাবনা থাকিবে না, ইহা আমাদের ধারণায় আসে না।

উত্তরে বলিলেন, যাহাদের জন্য চিন্তা-ভাবনা হইতে পারে, বেহেশতবাসীদের মনে তাহাদের কথা উদয়ই হইবে না। বর্ণিত আছে, বেহেশতবাসী যখন স্ব স্ব স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বসিবে তখন আল্লাহ তাআলা এক বিশেষ প্রকার বাতাস প্রবাহিত হওয়ার নির্দেশ দিবেন। সেই বাতাস বেহেশতবাসীদের দেহ স্পর্শ করার সাথে সাথে যাহাদের জন্য চিন্তা-ভাবনা হইতে পারে, এমনকি তাহার যে আপনজন দোযখী হইবে তাহার আকৃতি পর্যন্ত সে ভুলিয়া যাইবে। যেমন– আমরা এই পৃথিবীতে অনেক লোকের কথা ভুলিয়া যাই। আসল কথা হইল, আল্লাহর ইচ্ছাই ইচ্ছা এবং আল্লাহর কথাই কথা। অর্থাৎ তিনি যাহা ইচ্ছা সম্পাদন করেন এবং যাহা ইচ্ছা নির্দেশ দেন।

কোন এক বুযুর্গ বলেন, আল্লাহর হেকমত প্রসঙ্গে কথা বলার অধিকার তোমার কোথায় ? নিশ্বাস ছাড়িও না ! অন্যথায় ফাঁসী কাষ্ঠের উপর তোমার স্থান। ধৈর্যধারণ এবং চুপ করিয়া থাকাই তোমার পথ। তাহার চেয়ে উত্তম কোন পথ আর তোমার জন্য নাই।

ইহার পর কথাবার্তা এবং চলাফেরার সততা সম্বন্ধে বলিলেন, সততা এক প্রকার শক্ত রশি। ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কাজে মোমেনের কর্তব্য সততার আশ্রয় গ্রহণ করা, যেন তাহার দোজাহানের কাজের পরিণতি মঙ্গলময় হয়।

হযরত যুননূন মিসরী (রঃ) বলিয়াছেন, সততা আল্লাহর তরবারি। দুনিয়াতে এমন কোন বস্তু নাই যাহার উপর সেই তরবারি দ্বারা আঘাত করার পর উহা অক্ষত অবস্থায় থাকিতে পারে। তাই নিরাপত্তার জন্য সততার আশ্রয় গ্রহণ কর। তোমার পক্ষ হইতে সততা প্রকাশ পাইলে আল্লাহর পক্ষ হইতে বিজয় আসিবে।

মোমেনের কর্তব্য ঈমানের ব্যাপারে সততার আশ্রয় গ্রহণ করা এবং পদস্খলন হইতে সতর্ক থাকা। ইহা হইলেই পূর্ণভাবে নাজাত পাওয়া যাইবে।

তোমার পদযুগল যখন বিশ্বাসের দৃঢ়তায় সুদৃঢ় হইবে, তখন সমুদ্র হইতে মাটি এবং অগ্নি হইতে নম্রতা বাহির করিয়া লও। অর্থাৎ, তখন যেকোন কঠিন কাজই তুমি সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারিবে।

islamibookbd.wordpress.com

অষ্টম মজলিস

পীরের পরিচয়

একাদশ রবিউল আউয়াল, বৃহস্পতিবার। দরবার শরীফে প্রকৃত পীরের গুণাবলী সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা হইতেছিল– এই যুগে প্রকৃত পীর কে এবং কোথায় তাহার সন্ধান করিব ?

হযরত মাখদুম জাঁহা বলিলেন, যিনি তিনটি পথ অতিক্রান্ত করিয়াছেন এবং উহার আরোহণ ও অবরোহণের অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞাত, তিনিই পীর। তিনটি পথ হইল, শরীয়ত, তরীকত এবং হাকীকতের পথ। যেব্যক্তি এই তিনটি পথের সাথে পরিচিত নহে এবং অতিক্রম করে নাই, সে পীর নহে ; বরং শয়তান। তোমরা অনেককেই দেখ জায়নামাযে বসিয়া পীর হওয়ার দাবী করে। তাহারা কখনও পীর মুরশিদ নহে। বরং তাহারা এই পথের প্রতিমা এবং পৈতাস্বরূপ। তাহাদের অবস্থা তো নিম্নরূপ যে, সুন্দর মুখাকৃতি জ্ঞান হরণকারী। মর্যাদার অনুসন্ধানকারী এবং ধর্ম বিক্রেতা। সকলেই স্ব স্ব কাজের জ্ঞানে সামেরী সমতুল্য। প্রকাশ্যে মূসা দৃশ্যমান হইলেও ভিতরে ভিতরে বিষধর সাপ। তাহাদের অন্তর বাগানের দিকে, পৃথিবীর সম্পদের দিকে। তাহাদের জ্ঞান, শরীয়ত এবং ধর্ম আছে কি ? তাহারা একে অন্যের রক্ত পিপাসু।

লোকে এক বুযুর্গকে জিজ্ঞাসা করিল, প্রতিমা কি ? তিনি উত্তর করিলেন, যে বস্তু তোমাকে আল্লাহ হইতে ফিরাইয়া রাখে উহাই প্রতিমা এবং পৈতা। সাবধান ! কখনও এই জাতীয় পীরের ধোঁকায় পড়িবে না এবং তাহাদের নিকট যাইবে না। ইহারা ধর্ম পথের ডাকাত। কোন বুযুর্গ বলিয়াছেন ঃ

কিছু অনভিজ্ঞ লোক দরবেশী পোশাক পরিধান করিয়া রহিয়াছে। মুখে তাহাদের ধর্মের বাণী, অন্তরে কুফরী। তাহারা সততা পবিত্রতার পথে এক পদও অগ্রসর হয় নাই। ইহারা নেক লোকদের বদনামকারী।

ইহার পর যোহদ বা বৈরাগ্য সম্বন্ধে এরশাদ করিলেন, যাহারা হুযুর (সাঃ)-এর বাণী– "যাহারা পৃথিবী হইতে উদাসীন, পরকালের প্রতি আসক্ত ; আল্লাহর ফয়সালা এবং নির্ধারিত ভাগ্যের প্রতি সন্তুষ্ট, তাহারাই যাহেদ বা সংসার বিরাগী" মোতাবেক আমল করে, তাহারাই যাহেদ।

ওহে ভ্রাত ! পীর ও সংসারবিরাগী হওয়া বড়ই কঠিন কাজ। আত্মদর্শী এবং নফসের পূজারী এই সম্পদের অধিকারী হইতে পারে না। আবার আল্লাহ ইচ্ছা করিলে যাহাকে খুশী তাহাকেই দিতে পারেন। তাঁহার কাজের বিরোধিতা করার ক্ষমতা কাহারও নাই। তিনি যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করার একমাত্র অধিকারী। যাহা ইচ্ছা তাহাই করেন। তিনি পরম শক্তিশালী, তাই তাঁহার কাজ তাঁহার ইচ্ছা মোতাবেকই হইয়া থাকে।

হে ভ্রাত ! আমার কথা শোন ! তথাকথিত এই দরবেশদের প্রতি কখনও দৃষ্টিপাত করিবে না, এই দোকানদারদের প্রতি কখনও ফিরিয়া চাহিবে না। কারণ, ইহারা পথপ্রদর্শক নহে ; বরং ভ্রান্ত পথের নেতা।

তারপর বলিলেন, সকল বস্তুর মূল ঈমান। তারপর পীর হওয়া এবং সংসার-বিরাগী হওয়া। ঈমান পূর্ণতা লাভ করুক ইহা যেন কেহই চাহে না। ঈমানের পূর্ণতা কেহ কামনা করিলে অবশ্যই তাহার সেই প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হয় এবং তাহার আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়। কিন্তু সকলেই চায় পীর হইতে, সংসারবিরাগী এবং আবেদ হইতে। আর এই সমস্ত বিষয়বস্তু আসল উদ্দেশ্য সাধনের পথে প্রধান অন্তরায়। অর্থাৎ আসল উদ্দেশ্য লাভ হইতে বঞ্চিত হওয়ার উপকরণ। এতদসত্ত্বেও তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস, তাহারা উদ্দেশ্য সাধনে কৃতকার্য হইয়াছে। মানিয়া লইলাম যে, তাহারা সব কিছুই পাইয়াছে। কিন্তু ঈমান পূর্ণতা লাভ না করা পর্যন্ত মারেফাতের দৃষ্টিতে তাহারা মুসলমানই নহে।

তুমি সূফী হইয়াছ। সবুজ পোশাক পরিধান করিয়া চিল্লায় বসিয়াছ। সবই হইল, কিন্তু মুসলমান হও নাই।

আল্লাহর নিকট লজ্জিত হওয়া মোমেন বান্দার কর্তব্য। কারণ, লজ্জা ঈমানেরই একটি অংশ ; বরং লজ্জা ঈমানের আত্মা। মাথা যেমন দেহের অবিচ্ছেদ্য অংশ,

islamibookbd.wordpress.com

লজ্জাও তেমনি ঈমানের অপরিহার্য অংশ। লজ্জাহীন ব্যক্তি বেঈমান।

হুযুর (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, লজ্জা ঈমানের অংশ। যাহার লজ্জা নাই তাহার ঈমানও নাই।

ফলহীন বৃক্ষের যেমন কোন মূল্য নাই, তেমনি লজ্জাহীন ঈমানেরও কোন অস্তিত্ব নাই।

নবম মজলিস

বিচারক

তের রবিউল আউয়াল, শনিবার। জাহেল কাযী বা বিচারক ও তাহাদের ফয়সালা সম্বন্ধে কথাবার্তা হইতেছিল।

পীর ও মুরশিদ বলিলেন, হুযুর (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, এক বিচারক জান্নাতী আর দুই বিচারক দোযখী।

এই পবিত্র বাণী মোতাবেক বিচারক তিন প্রকার। প্রথম প্রকার কাযী আলেম, নিজের এলম দ্বারা শরীয়ত মোতাবেক ফয়সালা করেন এবং এই ফয়সালার ব্যাপারে তিনি নিঃস্বার্থ থাকেন। এই প্রথম প্রকারের কাযী জান্নাতী, আল্লাহ্ বলেন–

"ঈমানদার ও সৎকর্মশীলদের আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে, তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া বিরাট প্রতিদান দিবেন।"

দ্বিতীয় প্রকার কাযী আলেম। কিন্তু উৎকোচ গ্রহণ করিয়া শরীয়ত মোতাবেক ফয়সালা করিয়া থাকে। রায় দেওয়ার ব্যাপারে বাদী বিবাদী উভয় পক্ষ হইতে স্বার্থসিদ্ধির আশা পোষণ করে। নিঃস্বার্থভাবে কোন কাজই করে না। উৎকোচ গ্রহণকারী বিচারকের স্থান অবশ্যই দোযখে। তৃতীয় প্রকার কাযী জাহেল, অজ্ঞ ! শরীয়তের কাজ নিজের অজ্ঞতা দ্বারা সম্পন্ন করিয়া থাকে।

মানুষের অজ্ঞতা অগ্নিস্বরূপ। ওহে ভাই ! উহা এমনই অগ্নি যে, উহা দ্বারা একজন আলেম ভস্মে পরিণত হইতে পারে।

জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার প্রদীপ তোমার সম্মুখে রাখ। অন্যথায় মাথানত অবস্থায় অজ্ঞতার কূপে পড়িয়া যাইবে।

শেষোক্ত দুই প্রকার কাযী বা বিচারক সম্পর্কে শরীয়তের অভিমত, তাহারা দোযখী। অবশ্য মেহেরবান আল্লাহ ক্ষমা করিয়া দিতে পারেন।

এই প্রসঙ্গে হযরত পীর ও মুরশিদ একটি কাহিনী বলিলেন যে, এক শহরে একজন পীর ও একজন আলেম ছিলেন। উভয়ের গৃহদ্বার সামনাসামনি। উভয়ের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব বিরাজমান ছিল।

islamibookbd.wordpress.com

হঠাৎ সেই শহরের কাযী (বিচারক) মারা যান। আল্লাহর ইচ্ছা পূর্ণ হওয়ার মানসে সেই আলেমকে উক্ত শহরের কাযীর পদে নিয়োগ করা হইল।

বেশ কিছুদিন পরের ঘটনা। পীর সাহেবের কিছু গম পিষানোর প্রয়োজন দেখা দিল। পূর্বের ন্যায় দাসী সেই গম ভাঙাইতে কাযীর বাড়ী গেল। গম ভাঙাইয়া আসার সময় পীর সাহেব দাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার মাথায় কি?

দাসী বলিল, কাযী সাহেবের বাড়ী হইতে কিছু গম ভাঙাইয়া আনিলাম।

পীর সাহেব বলিলেন, আটা এখানে রাখিয়া তুমি চলিয়া যাও। পীর সাহেবের কথামত দাসী আটা রাখিয়া চলিয়া গেল।

অতঃপর পীর সাহেব তাহার কোন মুরীদকে ডাকিয়া বলিলেন–

এই আটা মাথায় লইয়া শহরময় ঘুরিয়া বেড়াও এবং ঘোষণা কর যে, এই আটা কাযীর বাড়ীর চাক্কিতে পিষানো হইয়াছে। যাহার ইচ্ছা বিনা পয়সায় লইতে পার।

পীরের নির্দেশমত মুরীদ আটা মাথায় করিয়া সমস্ত শহর ঘুরিয়া ফিরিয়া ঘোষণা করিল, কিন্তু কেহই সেই আটা লইতে রাযী হইল না।

মুরীদ ফিরিয়া আসিয়া পীরের খেদমতে আরয করিল, কাযীর চাক্কিতে পিষানো বলিয়া কেহই এই আটা গ্রহণ করিতে রাযী হইল না।

পীর সাহেব বলিলেন, এই আটা নদীতে ফেলিয়া দাও! মুরীদ পীরের নির্দেশমত তাহাই করিল। অতঃপর পীর সাহেব শপথ করিলেন, আমি যতদিন জীবিত আছি ততদিন আর এই নদীর পানি পান করিব না।

পীর সাহেব বলিলেন, ইহা ছিল সেই যুগের কাযীর চাক্কিতে পিষানো আটার অবস্থা। আর এই যুগের কাযীদের অবস্থা পরকালে কি হইবে তখনই তাহারা জানিতে পারিবে। অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী হইবে।

ধূলিঝড় সরিয়া যাওয়ার পর তুমি অবশ্য দেখিতে পাইবে যে, তোমার বাহন ঘোড়া না গাধা।

আজ শক্তি মদমত্ত অবস্থায় যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতেছ। কিন্তু কাল কেয়ামতের ময়দানে যখন তোমাকে আমলনামা দেওয়া হইবে এবং দাবীদারগণ হাযির হইবে তখন তোমার অবস্থা কি হইবে?

এই সমস্ত কাযীর সম্বন্ধে ভয়ানক শাস্তির কথা বলা হইয়াছে। হুযুর (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যাহাকে বিচারক করা হইয়াছে তাহাকে বিনা ছুরিতে হত্যা করা হইয়াছে।

মানসূরের শাসন আমলে ইমাম আবু হানিফা (রঃ) বিচারকের পদ গ্রহণ না করায় তাঁহাকে কতই না যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছিল। শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে বন্দিশালায় রাখিয়া অত্যাচার করা হয় এবং সেই অত্যাচার-উৎপীড়নেই তিনি মারা যান। তবু তিনি বিচারকের পদ গ্রহণ করেন নাই।

যাঁহারা সর্বক্ষণ নামাযরত অবস্থায় থাকেন, বিশ্বাস কর, তাঁহারাই রহস্যের ভাণ্ডার। তাঁহারা কাহারও প্রত্যাশী নহেন। আল্লাহর যিকরে লিপ্ত থাকিয়া অন্যের নিকটে অপ্রত্যাশী থাকেন। দরিদ্রতার চুল্লিতে জ্বলিতে থাকেন। নিজেকে প্রিয়ের চিন্তার আধারে পরিণত করেন, একত্বের প্রভাবে দোজাহান হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যান। আল্লাহ ব্যতীত যাবতীয় কিছু হইতে সব সময় আত্মরক্ষা করিয়া চলেন।

islamibookbd.wordpress.com

দশম মজলিস

সুখ-দুঃখ

চৌদ্দ রবিউল আউয়াল, রবিবার। মহান দরবারে উপস্থিত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করিলাম। পীর ও মুরশিদ যোহরের পর তাশরীফ আনিলেন। ভক্তবৃন্দও দরবারে উপস্থিত ছিলেন। সুখ-দুঃখ সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা হইতেছিল।

মাননীয় পীর ও মুরশিদ সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, এক দেশে এক বাদশাহ ছিলেন। তিনি তাহার মন্ত্রীকে বলিলেন, আমার এমন একটি আংটির প্রয়োজন যাহা দেখিলে আমার মন আনন্দিত হয়। অর্থাৎ যখন আমি কোন কারণে চিন্তিত থাকি তখন ঐ আংটি দেখিয়া যেন আমার চিন্তা দূর হইয়া যায় এবং আমার মনে আনন্দ স্রোত প্রবাহিত হয়।

মন্ত্রী বাদশাহর অভিপ্রায় শুনিয়া খুবই চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। ভাবিতে লাগিলেন– এখন আমি কি করিব ?

এই সমস্যার সমাধান করিতে তিনি দেশের গুণী-জ্ঞানী সকলকে পরামর্শ করার জন্য আহ্বান করিলেন। কিভাবে এই সমস্যার সমাধান করা যায় তাহাদের নিকট প্রশ্ন করিলেন।

তিনি সমবেত বিজ্ঞজনদের উদ্দেশে বলিলেন, আমার বাদশাহ আমাকে তো এই নির্দেশ দিয়াছেন। কিন্তু আমি চিন্তা-ভাবনা করিয়াও ইহার সমাধান খুঁজিয়া পাইতেছি না। আপনারা আমাকে সমাধান বলুন, আমি কি করিতে পারি ?

এই বিজ্ঞজনদের মধ্যে একজন খুবই অভিজ্ঞ, বুদ্ধিমান বুযুর্গ ছিলেন। তিনি অন্যান্য সকলের কথাবার্তা শুনার পর বলিলেন, হে মন্ত্রী মহোদয় ! বড়ই কঠিন কাজের নির্দেশ আপনাকে দেওয়া হইয়াছে। তবে আমার মতে আপনি একটি আংটি তৈয়ার করাইয়া উহাতে "এই সময়ও অতিবাহিত হইয়া যাইবে" কথা কয়টি খোদাই করিয়া দিন।

উপস্থিত অভিজ্ঞজনেরা সকলেই এই পরামর্শ সমর্থন করিলেন।

মন্ত্রী তাঁহাদের কথামত তখনই একটি আংটি তৈয়ার করাইয়া উহাতে উক্ত

কথাগুলি ক্ষোদিত করাইয়া বাদশাহর সমীপে পেশ করিলেন। আংটি দেখিয়া বাদশাহ খুব খুশী হইলেন এবং মন্ত্রীর কাজের জন্য তাহাকে বিশেষভাবে পুরস্কৃত করিলেন। কথিত আছে, হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর আংটিতেও উপরোক্ত কথা কয়টি সোনালী অক্ষরে ক্ষোদিত ছিল।

ইহার পর নিদ্রা সম্বন্ধে কথাবার্তা আরম্ভ হইল। হযরত পীর ও মুরশিদ এরশাদ করিলেন, নিদ্রা তিন প্রকার ঃ

১। আল্লাহর জন্য নিদ্রা

২। আল্লাহর সাথে নিদ্রা এবং

৩। আল্লাহ হইতে নিদ্রা।

প্রথম প্রকার নিদ্রার অর্থ এই যে, যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহর যিকর-আযকারে এতটা লিপ্ত থাকে যে, তাহার নফস পরিশ্রান্ত হইয়া পড়ে এবং সেই অবস্থায় সে যদি মনে করে যে, সামান্য পরিমাণ নিদ্রা গেলে শ্রান্তি দূর হইয়া যাইবে এবং এই নিদ্র আমার এবাদতে সাহায্যকারী হইবে, তখন নিদ্রা যাওয়া ভাল। অধিক এবাদত করার নিয়তে নিদ্রা যাওয়া এবাদতের মধ্যে পরিগণিত হইবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি তোমাদের জন্য নিদ্রাকে বিশ্রামস্বরূপ করিয়াছি। এই আয়াত এমন সব ব্যক্তির উদ্দেশেই অবতীর্ণ হইয়াছে। এই কারণেই এই নিদ্রাকে আল্লাহর জন্য নিদ্রা বলা হয়।

দ্বিতীয় প্রকার নিদ্রা হইল, যদি কোন ব্যক্তি নিদ্রা যাওয়া নিজের পক্ষে হারাম করিয়া যিকর-আযকারে ডুবিয়া থাকে এবং এই ডুবিয়া থাকার দরুন সে নিদ্রিত হইয়া পড়িলেও ইহা তাহার পক্ষে ইচ্ছাকৃত নিদ্রা নহে ; বরং আল্লাহর পক্ষ হইতেই সে নিদ্রিত হইয়া পড়ে। তাই ইহাকে আল্লাহর সাথে নিদ্রা বলা হয়।

তৃতীয় প্রকার নিদ্রা হইল, আল্লাহর এবাদত-বন্দেগী হইতে বিরত থাকিয়া নিদ্রা যাওয়া। যেমন– আমাদের নিদ্রা। আর ইহাই হইল প্রকৃত পাপ। কারণ, নফসের প্রতিপালন এবং শয়তানের নির্দেশ পালন করার জন্যই এই নিদ্রা। এই প্রকার নিদ্রা মানুষকে আল্লাহ হইতে গাফেল করিয়া দেয়। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, নিদ্রা মৃত্যুর ভাই।

এই প্রকার নিদ্রা সম্বন্ধেই কোন কবি বলিয়াছেন–

(ভাবার্থ) অলসতা করিয়া মূল্যবান সময় নষ্ট করিয়া দিয়াছ। তুমি কি উত্তর দিবে ? খেলাধুলায় দিন এবং নিদ্রায় রাত অতিবাহিত করিয়াছ। ওহে অলস ! অন্তরে

islamibookbd.wordpress.com

জাগ্রত থাক, দুনিয়ায় গাধার ন্যায় খাওয়া ও ঘুমানোর জন্য তোমার আগমন নহে।

ইহার পর তিনি মোমেনদের মঙ্গল সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে বলিলেন, চল্লিশ দিনের মধ্যে যদি মোমেন বান্দা কোন প্রকার বিপদে জড়িত হয় তবে ভাল। কারণ ইহার মধ্যেই তাহার মঙ্গল নিহিত রহিয়াছে। যদি কোন মোমেন চল্লিশ দিন পর্যন্ত নিরাপদ থাকে, কোন প্রকার বিপদে পতিত না হয় তবে গোমরাহীর ভয় রহিয়াছে। আল্লাহ আমাদিগকে নিরাপদ রাখুন।

এই প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন, একদিন মদীনায় হুযুর (সাঃ) এক মহিলাকে দেখিলেন এবং তাহাকে বিবাহ করার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

এক সাহাবী হুযুর (সাঃ)-এর অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আপনি যে মহিলাকে বিবাহ করিতে অভিলাষ করিয়াছেন, আমি তাহার সম্বন্ধে এতটা জানি যে, সে তাহার সারা জীবনে একবারও অসুস্থ হয় নাই। এমনকি কোন বিপদেও সে জড়িত হয় নাই।

এই কথা শুনিয়া হুযুর (সাঃ) এরশাদ করিলেন, তাহার মধ্যে কোন প্রকার মঙ্গল নাই। অতএব তিনি বিবাহ করার অভিপ্রায় পরিত্যাগ করিয়া এরশাদ করিলেন, ফেরআউন চারিশত বৎসর বয়স পাইয়াছিল। এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে সে কোন দিন পীড়িত হয় নাই। এমনকি একদিনের জন্য সে সর্দিতেও ভোগে নাই। দেখ, ইহার ফলে সে কোন্ প্রকার বিপদে পতিত হইল। সে দাবী করিল "আমি তোমাদের মহান আল্লাহ।" ইহার পরিণতি সে দুনিয়াতেই ভোগ করিল। অর্থাৎ সে তাহার পরিবার-পরিজনসহ নীল নদে ডুবিয়া মরিল।

আল্লাহ তাআলা এই প্রসঙ্গে বলেন, তোমরা দেখিতেছ, আমি ফেরআউনকে তাহার পরিবার-পরিজনসহ ডুবাইয়া দিলাম। পরকালে তাহাদের দোযখে নিক্ষেপ করা হইবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, তিনি প্রথম ও শেষ অসৎ কাজের প্রতিফল হিসাবে তাহাকে পাকড়াও করিলেন।

তাই চল্লিশ দিনের মধ্যে মোমেন বান্দার জান ও মালের উপর কোন বিপদ আসা প্রয়োজন। কারণ, মোমেনের বিপদের মধ্যে মঙ্গল নিহিত রহিয়াছে। সাধারণ লোকও যদি বিপদাপন্ন হয় তবে উহা দ্বারা তাহার পাপ মার্জনা হয়। আর যদি কোন সালেক বিপদাপন্ন হয় তবে তাহার মর্যাদা ও অবস্থার উন্নতি সাধিত হয়। আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।

একাদশ মজলিস

পরস্পর ভালবাসা

পনর রবিউল আউয়াল, সোমবার। পবিত্র আস্তানায় উপস্থিত ভক্তদের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করিলেন, পরস্পর যে ভালবাসা হয় এমন ভালবাসা জায়েয কিনা ? অথবা এরূপ ভালবাসা পরকালে কোন উপকারে আসিবে কিনা ?

হযরত এরশাদ করিলেন, একের সাথে অন্যের ভালবাসা পরকালের কোন কাজেই আসিবে না, তবে যে ভালবাসা আল্লাহর জন্য হয়। যেমন– পীর ও আলেমদের সাথে ভালবাসা, ইহা উপকারে আসিবে। ইহা ব্যতীত নফসের তাড়নায় বা পার্থিব স্বার্থের বশীভূত হইয়া যে ভালবাসা স্থাপন করা হয় তাহা দূষণীয় ; বরং এরূপ ভালবাসা দ্বারা মানুষ হারামে লিপ্ত হইয়া পড়ে। যেমন– কোন বেগানা মহিলার প্রতি হঠাৎ দৃষ্টি পতিত হওয়া। কিন্তু ভালবাসার দৃষ্টিতে দ্বিতীয়বার তাহার প্রতি তাকানো হারাম। হুযুর (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, তোমার প্রথম দৃষ্টির জন্য জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে না। কিন্তু দ্বিতীয়বার তাকানোর জন্য পাকড়াও করা হইবে।

নফসের তাড়নায় পার্থিব স্বার্থবশত যে ভালবাসা হয় তাহা চিরস্থায়ী নহে। কারণ, ইহা সৃষ্টির প্রতি ভালবাসা। আর সৃষ্টির প্রতি ভালবাসা নশ্বর, অবিনশ্বর নহে, ক্ষণস্থায়ী ও ধ্বংসশীল। বরং স্রষ্টার সাথে যে ভালবাসা স্থাপন করা হয় তাহা অবিনশ্বর ও চিরস্থায়ী। কারণ, তাহার অস্তিত্ব কেয়ামতে অবশ্য ফলদায়ক হইবে। ইহার পর আমি আরয করিলাম, আজ এই দুনিয়ায় একে অন্যকে ভালবাসে, একে অন্যের সান্নিধ্য কামনা করে এবং একে অন্যের আপনজন। পরকালেও কি এমন সম্বন্ধ বিদ্যমান থাকিবে।

তিনি বলিলেন, পৃথিবীতে যেমন বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়স্বজন আছে, পরকালেও তেমনি থাকিবে। বরং সেখানে যদি কাহারও মনে এই আশা জাগ্রত হয় যে, আমি অমুক বন্ধু বা অমুক আত্মীয়ের সাথে সাক্ষাত করিতে যাইব। এরূপ ধারণা পূর্ণভাবে মনে উদয় হইতে না হইতেই সে যে আসনে বসা থাকিবে তাহা গতিশীল হইয়া অগ্রসর হইতে থাকিবে।

islamibookbd.wordpress.com

আল্লাহ তাআলা বলেন, পরহেযগারগণ ব্যতীত আজ এক বন্ধুর অন্য বন্ধুর শত্রুতে পরিণত হইবে।

বেহেশতে কোন প্রকার দুঃখ-কষ্ট থাকিবে না। জান্নাতবাসীদের অবস্থা জানিতে চাহিলে আল্লাহর এই বাণীর প্রতি খেয়াল কর– জান্নাতবাসী যাহা চাহিবে তাহাই সেখানে মওজুদ পাইবে। তদ্রূপ অন্যান্য আয়াতেও জান্নাতের অবস্থা বর্ণনা করা হইয়াছে। সেইসব আয়াত পাঠ করিলেই জানিতে পারিবে।

দ্বাদশ মজলিস

কোরআনের ফযীলত

সতের রবিউল আউয়াল, বুধবার। কোরআনের মুকাত্তায়াত শব্দ সম্বন্ধে আলোচনা হইতেছিল। এক বন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন, ইমাম যাহেদীর তাফসীরে উল্লেখ রহিয়াছে, কোরআন তেলাওয়াতকারীদের সম্বন্ধে হুযুর পাক (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, কোরআনের প্রতিটি শব্দ তেলাওয়াত করার জন্য দশটি করিয়া নেকী বা পুণ্য লিখিত হইয়া থাকে, দশটি পাপ ক্ষমা করা হয় এবং দশটি মর্যাদার স্তর উন্নীত করা হয়।

হাদীসের শেষে বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু আমি বলিতেছি না যে, الم একটি শব্দ। বরং আলিফের পরিবর্তে দশ, লামের পরিবর্তে দশ এবং মীমের পরিবর্তে দশটি পুণ্য দান করা হইয়া থাকে। অতএব, ইহাকে একটি শব্দ বলিও না। ইহার কারণ কি?

আমাদের পীর ও মুরশিদ বলিলেন, আল্লাহ ও রাসূলের মধ্যে একটি রহস্য বিদ্যমান রহিয়াছে, তাই উহাকে শব্দ বলা যায় না। যদি শব্দ বলা হয় তবে মুকাত্তায়াতের দ্বারা আরম্ভের পূর্ণতা শেষ হইয়া যায়। কারণ, যদি শব্দ বলি তবে উহার বর্ণ জানা আছে এবং মুকাত্তায়াতে সংযুক্ত বর্ণ এবং অর্থ– উভয়ের দিক হইতেই যেমন মুকাতায়াত্তাতের অর্থ জানা নাই তেমন উহার বর্ণও জানা নাই। এই কারণেই মুকাত্তায়াতকে শব্দ বলা যায় না।

তিনি যে বলিয়াছেন, আলিফের পরিবর্তে দশ, লামের পরিবর্তে দশ এবং মীমে পরিবর্তে দশ পুণ্য পাওয়া যাইবে, এই বর্ণনা মুকাত্তায়াতের শব্দ সম্বন্ধে নহে ; বরং ইহা পাঠ করার পুণ্য।

তারপর সেই বন্ধু বলিলেন, অন্য আর এক কিতাবে বর্ণিত আছে, মুকাত্তায়াত কয়েক প্রকার। কোনটি তিন, কোনটি দুই আবার কোনটি একবর্ণ বিশিষ্ট। এই বর্ণনা দ্বারা তো ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, মুকাত্তায়াত শব্দ।

হযরত পীর সাহেব বলিলেন, ইহা আল্লাহর হেকমত বর্ণনা করার জন্য বলা

islamibookbd.wordpress.com

হইয়াছে। তিন বর্ণ, দুই বর্ণ এবং এক বর্ণের মধ্যেও যে আল্লাহর হেকমত রহিয়াছে, ইহাতে তাহাই বর্ণনা করিয়াছেন।

ইহার পর কোরআন ও তাওরাতের আলোচনা প্রসঙ্গে বলিলেন, তাওরাত হযরত মূসা (আঃ)-এর উপর অবতীর্ণ হয়। তাহা এত বিরাটাকার ছিল যে, আশি উটের বোঝার পরিমাণ ছিল। শরীয়তের বিষবস্তু তাওরাতে পূর্ণ ব্যাখ্যার সাথে খোলাখুলিভাবে বর্ণিত ছিল। তাই সেই যুগে এজতেহাদের কোন প্রয়োজন ছিল না। এই কিতাব মূসা (আঃ)-এর সম্পূর্ণ মুখস্থ ছিল।

হযরত মূসা (আঃ)-এর ইনতেকালের পর বখতে নাস্‌সারে আবির্ভাব ঘটে। বখতে নাস্‌সার বায়তুল মোকাদ্দাস্ ধ্বংস করিয়া তাওরাত জ্বালাইয়া ফেলে। তাওরাত জ্বালাইয়া দেওয়ায় বনী ইসরাঈলগণ হয়রান-পেরেশান হইয়া পড়ে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা বনী ইসরাঈলদের প্রতি অতি মেহেরবান ছিলেন। তিনি তাহাদের মধ্যে হযরত ওযায়ের (আঃ)-কে পয়দা করেন। হযরত ওযায়ের (আঃ) বনী ইসরাঈলদিগকে বলিলেন, তাওরাত আমার কণ্ঠস্থ আছে, আমি বলি তোমরা লিখিয়া লও। এই কথা শুনিয়া তাহারা খুবই সন্তুষ্ট হইল। তাহারা হযরত ওযায়েরের নিকট হইতে তাওরাত লিখিয়া লইল। তাহা সত্তর উটের বোঝার সমপরিমাণ হইল।

দশ বোঝা কম হওয়ার ফলে বনী ইসরাঈলদের মনে খটকা দেখা দিল এবং শয়তান তাহাদিগকে প্ররোচিত করিতে লাগিল যে, এই লিখিত তাওরাত মূল তাওরাতের ন্যায় কিনা ? উভয়ের সাথে মিল আছে কিনা ? এই সন্দেহের বশীভূত হইয়া তাহারা আসল তাওরাতের সন্ধানে রহিল।

বহু দিন পর তাহারা এক বৃদ্ধার সন্ধান পাইল। সেই বৃদ্ধা তাহাদিগকে বলিল, হযরত মূসা (আঃ)-এর জীবদ্দশায় একখণ্ড তাওরাত মাটির তলায় প্রোথিত করিয়া রাখা হইয়াছিল, কোথায় রাখা হইয়াছিল আমি তাহা জানি। যদি আমি তাহা বাহির করিয়া দিতে পারি তবে তোমরা আমাকে কি পুরস্কার দিবে ?

লোকে নানা প্রকার উপহার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিল। বৃদ্ধা স্থান দেখাইয়া দিল। মাটি খোদাইর পর সত্যই প্রোথিত তাওরাত পাওয়া গেল। সকলেই তাহাদের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বৃদ্ধাকে নানা প্রকার উপঢৌকন দিয়া সন্তুষ্ট করিয়া দিল। অতঃপর তাহার সাথে হযরত ওযায়ের (আঃ)-এর তাওরাত মিলাইয়া দেখা হইল, কোথাও কোন প্রকার গরমিল নাই। আসল কপির সাথে হুবহু মিল রহিয়াছে।

ইহার ফলে বনী ইসরাঈলদের ঈমানে খটকা দেখা দিল। তাহারা বলাবলি করিতে লাগিল, যে কিতাব সত্তর উটের বোঝার সমান তাহা কণ্ঠস্থ করিয়া রাখা একজন মানুষের পক্ষে কিভাবে সম্ভবপর হইতে পারে। তাই ওযায়ের কখনও মানব সন্তান নহে ; বরং তিনি আল্লাহর পুত্র। এই কুধারণায় পতিত হইয়া তাহারা বেঈমান হইয়া গেল।

তাওরাত, যবুর, ইনজীল এবং অন্যান্য আসমানী গ্রন্থে যাহা কিছু আছে তাহার সংক্ষিপ্তসারই আল্লাহ তাআলা কোরআনে বর্ণনা করিয়াছেন। এই সংক্ষিপ্ততার জন্যই আল্লাহ তাআলা কোরআনকে হুহুফ বলিয়াছেন।

islamibookbd.wordpress.com

ত্রয়োদশ মজলিস

তাকবীর দেওয়া

আঠার রবিউল আউয়াল, বৃহস্পতিবার। আমরা অনেকেই খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। দরবেশদের তাকবীর দেওয়া সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা হইতেছিল যে, তাহারা যেখানে যান সেখানেই তাকবীর ধ্বনি করেন, এই নীতি কোথা হইতে আসিল ? হযরত শায়খ এরশাদ করিলেন, এমনভাবে তাকবীর দেওয়ার নিয়ম রহিয়াছে। যখন কোন লোক দ্বীন অথবা দুনিয়ার নেয়ামত প্রাপ্ত হয় তখন উক্ত নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় এবং আরও নেয়ামত যেন পাওয়া যায় তজ্জন্য তাকবীর দেওয়া জায়েয। কিন্তু যখন তখন বা যেখানে সেখানে তাকবীর দেওয়া জায়েয নহে। তাকবীর হামদ বা প্রশংসার অর্থে ব্যবহৃত হয়।

একবার হুযুরে আকরাম (সাঃ) সাহাবায়ে কেরামের সমাবেশে উপবিষ্ট ছিলেন। হুযুর (সাঃ) তাঁহাদের উদ্দেশে এরশাদ করিলেন, আমি আশা করি পরকালে তোমরা বেহেশতের এক চতুর্থাংশ স্থানের অধিকারী হইবে। অবশিষ্ট তিন চতুর্থাংশ অন্যান্য নবীর উম্মতদের অধিকারে থাকিবে। হযরত আবু বকর (রাঃ) ও অন্যান্য সাহাবী এই পবিত্র বাণী শ্রবণ করত নেয়ামতের আধিক্যের শুকরিয়া আদায়ের জন্য আল্লাহু আকবার বলিয়া তাকবীর ধ্বনি করিলেন, যেন আল্লাহ তাআলা তাঁহাদিগকে আরও অধিক নেয়ামত দান করেন।

আবার এরশাদ করিলেন, আমি আশা করি আল্লাহ তোমাদিগকে বেহেশতের অর্ধেক দান করিবেন এবং অবশিষ্ট অর্ধাংশ অন্যান্য নবীর উম্মতদের জন্য হইবে। এই পবিত্র বাণী শ্রবণ করত হযরত ওসমান, হযরত আলী এবং অন্যান্য সাহাবী বসা হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া আল্লাহর নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করার জন্য তাকবীর ধ্বনি করিতে থাকেন।

আবার এরশাদ করিলেন, আমার উম্মতগণ সর্বপ্রথম বেহেশতে প্রবেশ করার অনুমতি পাইবে। অতঃপর অন্যান্য উম্মতগণ বেহেশতে যাইবে। এই বাণী শুনিয়া হযরত আলী (রাঃ) এবং অন্যান্য সাহাবী দণ্ডায়মান হইয়া আল্লাহু আকবার বলিয়া তাকবীর ধ্বনি করিলেন।

এই হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, বিশেষ ক্ষেত্রে তাকবীর ধ্বনি করা জায়েয। কিন্তু যেখানে সেখানে যখন তখন তাকবীর দেওয়া জায়েয নহে।

অতঃপর এই আলোচনা হইতে লাগিল যে, মুরীদ যদি নফল নামায আদায় করিতে থাকে এবং এ মুহূর্তে পীর ও মুরশিদ তাহাকে ডাকেন তখন মুরীদের কর্তব্য কি ? মুরীদ কি নামায ছাড়িয়া পীরের আহ্বানে সাড়া দিবে না নামায আদায় করিয়া সাড়া দিবে।

পীর ও মুরশিদ এরশাদ করিলেন, এই অবস্থায় পীরের আহ্বানে সাড়া দেওয়াই উত্তম। ইহাতে বেশী পুণ্যের অধিকারী হইবে। একবার আমি নফল নামায আদায় করিতেছিলাম। এমন সময় আমার পীর ও মুরশিদ আমাকে ডাক দিলেন। আমি খেদমতে হাযির হইলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কি করিতেছিলে ? আমি বলিলাম, নফল নামায আদায় করিতেছিলাম। আপনার ডাক শুনিয়া নামায ছাড়িয়া খেদমতে উপস্থিত হইলাম। তিনি বলিলেন, ভাল করিয়াছ। তোমার এই কাজ নফল নামাযের চেয়ে বেশী পুণ্যময়। কেননা, পীরের কাজে নিয়োজিত থাকা ঠিক ধর্মীয় কাজে নিয়োজিত থাকার সমতুল্য।

তিনি বলিলেন, একবার আমি আমার পীর ও মুরশিদের দরবারে উপস্থিত ছিলাম। অন্য দরবেশগণও উপস্থিত ছিলেন। এই সময় আমাদের মধ্যে ওলীদের সম্বন্ধে কথাবার্তা হইতেছিল। ইত্যবসরে এক ব্যক্তি আসিয়া আরয করিল, আমি মুরীদ হওয়ার জন্য আসিয়াছি। পীর ও মুরশিদ বলিলেন, আমি তোমাকে যাহা কিছু বলিব তাহা যদি পালন করিতে রাযী থাক তবে এই শর্তেই আমি তোমাকে বায়আত করিতে পারি। আগন্তুক তাঁহার কথায় রাযী হইয়া গেল।

পীর ও মুরশিদ বলিলেন, তবে কালেমা তাইয়্যেবা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু পাঠ কর। কালেমা পাঠ করার পর বলিলেন, এই কালেমা শরীফ সর্বক্ষণ অন্তরে অন্তরে পাঠ করিবে। তারপর তাহাকে বায়আত করিয়া বহু খেলাত দান করিলেন এবং বলিলেন, আমার উদ্দেশ্য ছিল তোমাকে পরীক্ষা করা যে, আমার প্রতি তোমার কতটা দৃঢ় বিশ্বাস আছে। আমার ইচ্ছা যে, তুমি এইভাবে কালেমা শরীফ পাঠ কর। অন্যথায় আমার এমন কি গুণ-গরিমা আছে ? আমি তো হুযুর (সাঃ)-এর একজন সামান্যতম দাস। এই কালেমা তো তুমি প্রথম হইতে পাঠ করিয়া আসিতেছ। প্রথম বিশ্বাস ও আগ্রহে ইহাই প্রমাণিত হইল যে, তুমি আমার

islamibookbd.wordpress.com

সত্যিকারের মুরীদে পরিণত হইয়াছ। নিজেকে সত্যিকারের মুরীদ প্রমাণিত করাই মুরীদের কর্তব্য।

ইহার পর এরশাদ করিলেন, তওবা করার পর তওবাকারীর উচিত নহে পাপাচারীদের সাথে সংস্রব রাখা, যাহার ফলে সে পুনরায় পাপ কাজে লিপ্ত হয়। অসৎ সঙ্গের চেয়ে এমন ক্ষতিকর আর কিছু নাই। কারণ, অসৎ সঙ্গের প্রতিক্রিয়া অবশ্যই কার্যকর হইয়া থাকে ! খারাপ কাজ হইতেও তওবা করিবে এবং আত্মরক্ষা করিয়া চলিবে। অন্যায় কাজও তাহার শত্রু।

এই প্রসঙ্গে তিনি একটি ঘটনা বলিলেন যে, হামীদ উদ্দীন বাহওয়ানী নামক এক ব্যক্তি তওবা করেন। তাহার সাথী-সঙ্গীগণ আসিয়া বলিল, বন্ধু ! চল আমরা আবার আমাদের কাজে লাগিয়া যাই। তিনি বন্ধুদিগকে বলিলেন যাও, রাস্তা দেখ। আমার মত অসহায় লোকের পিছন ছাড়। আমি তওবা করিয়াছি। খোদা না করুন, কোন মতেই আমি তওবা হইতে ফিরিব না।

এই সমস্ত কথাবার্তা হইতেছিল, এমন সময় খাবার আসিল। আমরা সকলেই খাইতে বসিয়া গেলাম। ইত্যবসরে শায়খ নিযামুদ্দীন আবুল মুয়াইয়েদ উপস্থিত হইলেন এবং সালাম করিলেন। পীর ও মুরশিদ না তাঁহার সালামের উত্তর দিলেন আর না তাঁহার দিকে ততটা মনোযোগ দিলেন। শায়খ নিযামুদ্দীন ইহাতে বেশ কিছুটা মনঃক্ষুণ্ন হইলেন। আহারপর্ব শেষ হইবার পর শায়খ নিযামুদ্দীন জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনাদের আহার করার সময় আমি সালাম করিলাম, সালামের উত্তর দিলেন না কেন ?

এরশাদ করিলেন, আমরা আল্লাহর এবাদতে লিপ্ত ছিলাম! তখন সালামের উত্তর কিভাবে দিব বলুন। আল্লাহর এবাদত-বন্দেগী করার শক্তি-সামর্থ্য অর্জন করার জন্যই দরবেশগণ আহার গ্রহণ করেন এবং ইহাই তাঁহাদের একমাত্র নিয়ত থাকে। তাই যখন আল্লাহর এবাদতে মশগুল থাকা হয় তখন কিভাবে সালামের উত্তর দেওয়া যাইতে পারে ? আগন্তুকের উচিত সালাম করিয়াই খাইতে বসিয়া যাওয়া এবং খাওয়ার পর উঠিয়া পুনরায় সালাম করা।

অতঃপর এরশাদ করিলেন, আমিও এমন এক ঘটনার সম্মুখীন হইয়াছিলাম। একবার আমি শায়খ আবুল কাসেমের খানকায় গিয়া দেখি তাঁহারা সকলেই আহার করিতেছেন। আমি তাঁহাদিগকে সালাম করিলাম। তাঁহারা আমার সালামের না

উত্তর দিলেন আর না আমার দিকে ফিরিয়া চাহিলেন। আহারপর্ব শেষ হইলে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনারা আমার সালামের উত্তর দিলেন না– ইহা কেমন ব্যবহার ?

শায়খ আবুল কাসেম বলিলেন, নিয়ম তো এই যে, কেহ কোন সমাবেশে উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে খাইতে দেখিলে নিজেও খাইতে বসিয়া যাওয়া। খাওয়া শেষ হইলে উঠিয়া সালাম করিবে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, এই নিয়ম কোথায় পাইলেন ? জ্ঞানগত না বর্ণনাগত। তিনি বলিলেন, জ্ঞানগত। কেননা, এবাদতের শক্তি অর্জন করার নিয়তেই দরবেশগণ পানাহার করিয়া থাকেন। এই জাতীয় আহার এবাদতের মধ্যে পরিগণিত। সুতরাং, এবাদত করার সময় সালামের জবাব কিভাবে দেওয়া যাইতে পারে ?

এই কথা বলিয়াই হযরত আলমে সুক্‌রে নিমজ্জিত হইয়া পড়িলেন ! সে দিনকার মত দরবার বরখাস্ত হইয়া গেল।

islamibookbd.wordpress.com

চতুর্দশ মজলিস

হজ্জ

উনিশে রবিউল আউয়াল, শুক্রবার। আমরা অনেকেই পবিত্র খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। উপস্থিত দরবেশদের মধ্যে সাইয়েদ নূরুদ্দীন গযনবী, সাইয়েদ শরফুদ্দীন, শায়খ মুহম্মদ মুজাহদুয প্রমুখ দরবেশ এমন উন্নত পর্যায়ের ছিলেন যে, আরশ হইতে পাতাল পর্যন্ত সব কিছুই বিনা বাধায় দেখিতে পাইতেন। কাবা গৃহের মুসাফিরদের কথা আলাপ-আলোচনা হইতেছিল।

হযরত পীর ও মুরশিদ বলিলেন, যে আল্লাহর খাস বান্দা, তিনি যদি স্বীয় মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত থাকেন তবে কাবা গৃহকে নির্দেশ দেওয়া হয় ঐ খাস বান্দার চারিদিকে তাওয়াফ কর। এই কথা বলিতে বলিতে তিনি এবং উপস্থিত সকলে দণ্ডায়মান হইয়া এমন বিস্ময়ের জগতে চলিয়া গেলেন যে, সকলেই আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। অতঃপর সকলেই এমনভাবে তাকবীর পাঠ করিতে লাগিলেন– যেমন কাবা গৃহের তাওয়াফ করার সময় পাঠ করা হয়।

সকলেই তাকবীর পাঠ করিতেছিলেন এবং প্রত্যেকরই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হইতে তাজা রক্তধারা প্রবাহিত হইতেছিল। রক্তের যেই ফোঁটা মাটিতে পড়িতেছিল, উহাই তাকবীরের চিত্র অঙ্কন করিয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল।

আমাদের যখন জ্ঞান ফিরিয়া আসিল তখন দেখিলাম, কাবা আমাদের সম্মুখে। আমরা কাবার যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করত চারিবার তাওয়াফ করিলাম। এই সময় আমরা অদৃশ্য আওয়ায শুনিতে পাইলাম, হে বন্ধুগণ ! আমি তোমাদের তাওয়াফ, হজ্জ এবং নামায কবুল করিলাম। আর যাহারা তোমাদের অনুসারী তাহাদেরটাও কবুল করিলাম।

হযরত পীর ও মুরশিদ এরশাদ করিলেন, আল্লাহর ওয়াস্তে বিশুদ্ধ নিয়তে হজ্জ করিলে তাহার পাপ ক্ষমা করিয়া খাস বান্দাদের নামের তালিকায় তাহার নাম লিখিয়া রাখার জন্য আল্লাহ ফেরেশতাদিগকে নির্দেশ দান করেন। হজ্জের উদ্দেশ্য হইল সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর দরবারে আত্মসমর্পণ করা। এই আত্মসমর্পণের মাধ্যমেই

আল্লাহর সাথে নিবিড় ও গভীর সম্পর্ক স্থাপন করা হয়। নিজের যাবতীয় পাপ পরিত্যাগ করিয়া লজ্জিত না হইলে এই সম্পর্ক স্থাপন হয় না।

হযরত ফোযায়েল ইবনে ইয়ায বলেন, আমি একবার আরাফাতে অবস্থানকালে দেখিলাম, সকলেই কাকুতি-মিনতি করিয়া মহান আল্লাহর দরবারে দোআ করিতেছে। আর এক যুবক মাথানত করত চুপ করিয়া বসিয়া রহিয়াছে। আমি যুবককে জিজ্ঞাসা করিলাম, প্রিয় বৎস ! আজ এই মহান দিনে সকলেই আল্লাহর দরবারে দোআ করায় ব্যস্ত, অথচ তুমি চুপ করিয়া বসিয়া রহিয়াছ ?

যুবক আমার দিকে তাকাইয়া বলিল, হযরত ! আমি আমার জীবনের মূল্যবান অনেক সময় অযথা কাজে ও কথায় নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছি। তাই আমি লজ্জায় দোআ করার জন্য আল্লাহর দরবারে হাত উঠানোর সাহস পাইতেছি না।

আমি বলিলাম, তুমি দোআ কর। আল্লাহ মহান, অতি মেহেরবান। কাহাকেও বঞ্চিত করেন না। এই সমস্ত লোকের বরকতে তিনি তোমাকে তোমার উদ্দিষ্ট স্থানে পৌছাইয়া দিবেন।

আমার কথা শুনিয়া সে দোআ করার জন্য হাত উঠাইতেই তাহার মুখ হইতে এমনভাবে চিৎকার বাহির হইল যে, সাথে সাথে তাহার প্রাণবায়ু বাহির হইয়া গেল।

হজ্জের মূলতত্ত্ব এবং আসল উদ্দেশ্য হযরত জোনায়েদ বাগদাদী (রঃ)-এর নিম্নোক্ত ঘটনা হইতে সুন্দরূপে উপলব্ধি করা যায়।

জনৈক ব্যক্তি হযরত জোনায়েদ (রঃ)-এর নিকট আসিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ ?

সে ব্যক্তি উত্তর করিল, আমি হজ্জ করিয়া আসিয়াছি।

– তুমি হজ্জ করিয়াছ ?

– জি-হাঁ ! আমি হজ্জ করিয়াছি।

– তুমি যখন হজ্জ করার নিয়তে স্বগৃহ হইতে বাহির হও তখন কি তুমি তোমার ধন-সম্পদ পরিত্যাগ করার নিয়ত করিয়াছিলে ?

– জি-না। আমি তো এই সম্বন্ধে কোন চিন্তাই করি নাই।

– তাহা হইলে তো তুমি হজ্জের নিয়তে বাহির হও নাই।

islamibookbd.wordpress.com

আচ্ছা ! তুমি মক্কার পথে যে সমস্ত মনযিল অতিক্রম করিয়াছ এবং যেখানে যেখানে রাত অতিবাহিত করিয়াছ তখন তুমি আল্লাহর নৈকট্য লাভের মঞ্জিল এবং সে পথের প্রতিবন্ধকতাসমূহ অতিক্রম করার নিয়ত করিয়াছিলে কি ?'

– না, আমি এমন কোন নিয়ত করি নাই।

– তবে হজ্জ কিভাবে শুদ্ধ হইল ?

আচ্ছা ! যখন তুমি এহরাম বাঁধার নিয়ত করিয়া প্রাত্যহিক পোশাক দেহ হইতে পরিত্যাগ করিয়াছ, তখন কি উহার সাথে তোমার খারাপ স্বভাবও পরিত্যাগ করিয়াছ?

– আমার সেদিকে খেয়াল ছিল না।

– তবে তোমার এহরাম কিভাবে ঠিক হইল ?

তুমি যখন আরাফাতের ময়দানে দাঁড়াইয়াছিলে তখন কি তোমার মনে এই খেয়াল হইয়াছিল যে, তুমি আল্লাহর দরবারে দণ্ডায়মান এবং তাঁহাকে দেখিতেছ ?

– না, আমি এমন খেয়াল করি নাই।

– তবে তুমি যেন আরাফাত ময়দানে দণ্ডায়মানই হও নাই।

তাওয়াফ করার সময় তুমি তোমার প্রতি আল্লাহর মেহেরবানী অবতীর্ণ হইতেছে এমন কিছু অনুভব করিয়াছ কি ?

– না, এমন কিছু অনুভব করি নাই।

– তবে তো তুমি তাওয়াফই কর নাই।

সাফা ও মারওয়ায় দৌড়ানোর সময় কেন দৌড়াইতেছ তাহা চিন্তা করিয়াছ কি?

– না, করি নাই।

– তবে তোমার সায়ী হয় নাই।

কোরবানী করার সময় তুপি পাপ বিসর্জন দেওয়ার নিয়ত করিয়াছিলে কি ?

– না।

– তবে তোমার কোরবানী করার সার্থকতা কোথায় ?

আচ্ছা ! তুমি যখন কঙ্কর নিক্ষেপ করিয়াছিলে তখন কি এই নিয়ত করিয়াছিলে

যে, আল্লাহ যেন আমার পাপরাশি আমা হইতে এমনভাবেই দূরে নিক্ষেপ করিয়া দেন।

– না, আমি এই নিয়ত করি নাই।

তাহা হইলে তোমার হজ্জের কোন কাজই সুসম্পন্ন হয় নাই। অর্থাৎ যথার্থভাবে তোমার হজ্জ হয় নাই। সুতরাং তুমি ফিরিয়া যাও এবং মাকামে ইবরাহীম পর্যন্ত গিয়া পৌঁছ। যেই মাকাম সম্বন্ধে আল্লাহ পাক এরশাদ করিয়াছেন, ইবরাহীম তাঁহার প্রভুর নিকট কৃতজ্ঞতার হক আদায় করিয়াছেন।

হযরত পীর ও মুরশিদ বলিলেন, হযরত আবু ইয়াযীদ (রঃ) বলেন, আমি প্রথমবার হজ্জ করিতে গিয়া দেখি, মক্কা শরীফে একমাত্র কাবা ব্যতীত আর কোন কিছুই নাই। দ্বিতীয়বার হজ্জ করিতে গিয়া কাবা গৃহ এবং উহার মালিককে দেখিতে পাইলাম।

তিনি আবার বলিলেন, হজ্জ মানুষের সকল পাপ বিদূরিত করিয়া দেয়। একবার হুযুর (সাঃ) মুযদালেফা হইতে রওয়ানা হওয়ার সময় সকলকে বলিলেন, তোমরা চুপ করিয়া থাক। সকলেই নীরবে দণ্ডায়মান হইয়া রহিলেন। অতঃপর তিনি এরশাদ করিলেন, হে উপস্থিত জনতা ! আজ আল্লাহ তোমাদের প্রতি খুবই মেহেরবান। নেককার ব্যক্তিদের জন্য তোমাদের মধ্যকার পাপী ব্যক্তিও ক্ষমা প্রাপ্ত হইয়াছে। নেককার ব্যক্তি আল্লাহর নিকট যাহা কিছু প্রার্থনা করিয়াছে তাহাই পাইয়াছে। তোমরা সকলে ক্ষমা পাইয়াছ, এখন অগ্রসর হও।

এমন সময় এক গ্রাম্য আরব হুযুর (সঃ)-এর উটের লাগাম ধরিয়া আরয করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! যে খোদা আপনাকে সত্য নবীরূপে প্রেরণ করিয়াছেন তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি, এমন কোন পাপ নাই যাহা আমি করি নাই ? আজ আল্লাহ্ আমাকেও কি ক্ষমা করিয়াছেন ?

হুযুর (সাঃ) এরশাদ করিলেন, তোমার পূর্ববর্তী পাপরাশি ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন। আমার উটের লাগাম ছাড় এবং এখন হইতে আরও বেশী সৎ কাজে আত্মনিয়োগ কর।

এই কথা বলার পর সেদিনকার মত মজলিস শেষ করা হইল।

islamibookbd.wordpress.com

পঞ্চদশ মজলিস

ওলীদের কাশফ ও কারামত

বিশে রবিউল আউয়াল, শনিবার। কাবা শরীফের ফযীলত সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা হইতেছিল।

হযরত পীর ও মুরশিদ বলিলেন, হযরত ইবরাহীম (আঃ) কাবা গৃহ নির্মাণ করার পর আল্লাহ তাআলা আদেশ করিলেন, হে বন্ধু ! কাবা গৃহ যিয়ারত করার জন্য আমার বান্দাদিগকে আহ্বান কর।

হযরত ইবরাহীম (আঃ) আরয করিলেন, হে আল্লাহ ! আপনার বান্দাগণ আমার আহ্বান কি করিয়া শুনিবে ?

আল্লাহ তাআলা এরশাদ করিলেন, আহ্বান করা তোমার কর্তব্য। কিভাবে তোমার আহ্বান তাহাদের কর্ণগোচর হইবে সে ব্যবস্থা আমি করিব।

হযরত ইবরাহীম (আঃ) কোবায়েস পাহাড়ে আরোহণ করিয়া বলিলেন–

হে মানবমণ্ডলী ! আল্লাহ আমাকে কাবা নির্মাণ করার নির্দেশ দিয়াছেন। আমি তাহা নির্মাণ করিয়াছি। তারপর তোমাদিগকে আহ্বান করার নির্দেশ দিয়াছেন। তোমরা আমার আহ্বানে সাড়া দাও এবং কাবার যিয়ারত কর। আল্লাহ তোমাদিগকে ক্ষমা করিবেন।

যাহারা বাপের ঔরসে ও মায়ের পেটে ছিল, আল্লাহ স্বীয় কুদরত দ্বারা এই আহ্বান তাহাদের কানে পৌছাইয়া দিলেন। ঐদিন যেব্যক্তি হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর আহ্বান শুনিয়া একবার লাব্বায়েক বলিয়াছিল সে একবার হজ্জ আদায় করিয়াছে, যে দুই বা ততোধিকবার লাব্বায়েক বলিয়াছে সে দুই বা ততোধিকবারই হজ্জ করিয়াছে বা করিবে। আর যে লাব্বায়েক বলে নাই সে হজ্জ করিতে পারিবে না।

কাবা যিয়ারত করার পুণ্য যেকোন সময়ই ছিল এবং থাকিবে। যাহারা এই আহ্বানে সাড়া দিয়াছে তাহারাই হজ্জ করার ভাগ্যে ভাগ্যবান হইবে।

তাহার পর বলিলেন, হজ্জ ও অন্যান্য সময়**কার তাওয়াফ শেষ** করিয়া লোক

যখন সাফা ও মারওয়া পাহাড়ে সায়ী করার জন্য যাইত, তখন সেখানে এক বৃদ্ধা খোঁড়া মহিলাকে দেখিতে পাইত। বৃদ্ধা মহিলার কাজ ছিল, যাহারা সায়ী করিত তাহাদের কাপড়-চোপড় নিজের দায়িত্বে রাখা।

একবার এক ভারতীয় হজ্জ করিতে গিয়া সেই বৃদ্ধা মহিলাকে দেখিয়া বলিল, তুমি তো অমুক স্থানে থাক ; আমি তোমাকে চিনি।

মহিলা বলিল, আমি অন্য কোথাও থাকি না। সারা বৎসর এখানে থাকিয়া লোকদিগকে সায়ী করিতে সাহায্য করি।

ইহার পর মাখদুম জাঁহা বলিলেন–

যেব্যক্তি "আমি হাযির ! হে আল্লাহ আমি হাযির। তোমার কোন শরীফ নাই। আমি হাযির। সমস্ত প্রশংসা এবং নেয়ামত তোমারই। তোমারই রাজত্ব। তোমার কোন অংশীদার নাই" বলে, ইহা সেই আহ্বানেরই জবাব।

যাহারা কাবার যিয়ারত করে তাহারা ঐ আহ্বান শুনিয়াছিল এবং কবুল করিয়াছিল।

তারপর বলিলেন, আরববাসী দুইটি বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। প্রথম– প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা, কোন মতেই ওয়াদার খেলাফ না করা। দ্বিতীয়– মেহমানদারী করা। মেহমান যাহার বাড়ীতে উপস্থিত হউক না কেন, কোন মতেই তাহাকে অন্যের মেহমান হইতে দেয় না।

তাহারা দাস-দাসীদিগকে নির্দেশ দিয়া রাখে, আমার অনুপস্থিতিতে কোন মেহমান আসিলে সে যেন ফিরিয়া না যায় এবং কোনমতেই যেন তাহার অনাদর করা না হয়।

বর্ণিত আছে, একবার হযরত খিযির (আঃ)-এর সাথে হযরত মূসা (আঃ)-এর সাক্ষাত হয়। উভয়ে এক সাথে কোন এক গ্রামে গিয়া উপস্থিত হন। উভয়ে ক্ষুধার্ত ছিলেন। খাওয়ার মত কোন বস্তু তাঁহাদের সাথে না থাকায় তাঁহারা গ্রামবাসীর নিকট খাবার চাহিলেন। কিন্তু কেহই তাঁহাদিগকে আহার্য দিতে রাযী হইল না।

এই কথা আরবময় প্রচার হইয়া গেল যে, অমুক গ্রামে আল্লাহর দুই জন নবী গিয়াছিলেন এবং ক্ষুধায় কাতর হইয়া গ্রামবাসীর নিকট খাদ্য চাহিয়াছিলেন। কিন্তু কেহই তাঁহাদের কথায় কান দেয় নাই। তাঁহারা ক্ষুধার্ত অবস্থায়ই রাত কাটান এবং পর দিন সেখান হইতে চলিয়া যান।

islamibookbd.wordpress.com

ইহার পর সকলে মিলিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল যে, অতঃপর উক্ত গ্রামবাসীদের সাথে অন্য কোন গোত্র বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারিবে না। আজ পর্যন্ত এই ব্যবস্থা কার্যকর রহিয়াছে। তাহাদের কথা ছিল, যে গ্রামে আল্লাহর নবী যান এবং তথাকার লোক তাঁহাদিগকে মেহমানদারী করে না, এমন লোকের সাথে আত্মীয়তা করা যায় না।

যাহারা হযরত মূসা ও খিযির (আঃ)-এর মেহমানদারী করে নাই তাহারা সকলেই গতায়ু। কিন্তু তাহাদের বংশধর আজও সেই গ্লানি বহন করিয়া চলিয়াছে।

হুযুর (সাঃ) যখন নবুয়ত প্রাপ্ত হন, ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকেন এবং তাঁহার নিকট অহী আসিতে থাকে, তখন একদিন অহী আসিল–

"এমনকি যখন তাহারা গ্রামবাসীদের নিকট উপস্থিত হইয়া ক্ষুণ্নিবৃত্তির জন্য খাদ্যদ্রব্য চাহিলেন, তখন তাহারা তাহাদিগকে খাবার দিতে অস্বীকার করিল।"

যখন সেই গ্রামবাসী জানিতে পারিল, আমাদের এই সংবাদ হুযুর (সাঃ)-কে অহী দ্বারা অবগত করানো হইয়াছে, তখন তাহারা খুবই দুঃখিত হইল। তাহারা বলিল, এই কলঙ্কের টিকা কেয়ামত পর্যন্ত আমাদের কপালে অঙ্কিত হইয়া থাকিবে।

তাহারা সকলে পরামর্শ করিয়া বলিল, তাহাদের জন্য সুযোগ আসিয়াছে, ইসলাম প্রচারের মাত্র সূচনা। আল্লাহর রাসূলও হিজরত করিয়া মদীনায় তাশরীফ আনিতেছেন, তাঁহার সাথীগণ নিঃস্ব অবস্থায় তাঁহার সাথে মদীনায় আগমন করিয়াছেন। চল, আমরা ধন-সম্পদ লইয়া তাঁহার খেদমতে উপস্থিত হই।

পরামর্শমত তাহারা হুযুর (সাঃ)-এর সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমাদের সম্বন্ধে আপনার নিকট অহী আসিয়াছে। আয়াতের যেখানে "অস্বীকার করিল" শব্দ আছে উহার পরিবর্তে সেখানে "দানকারী" শব্দটি সংযোগ করিয়া দিন, যাহাতে আমরা এই কলঙ্ক হইতে রেহাই পাইতে পারি।

এই কথা শুনিতেই তিনি ক্রোধান্বিত হইয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পর বলিলেন, ইহা আল্লাহর বাণী। এই বাণী পরিবর্তন করার ক্ষমতা কাহারও নাই ; বরং অন্য কিছু করার থাকিলে বল, আমার শক্তিমত তাহা করার চেষ্টা করিব।

হতভাগার দল বিফল মনোরথ হইয়া তাহাদের ধন-সম্পদসহ চলিয়া গেল। কেয়ামত পর্যন্ত তাহাদের এই কলঙ্ক উজ্জ্বল হইয়া রহিয়া গেল।

তারপর বলিলেন, মক্কার কাফেরদের অত্যাচার-উৎপীড়ন যখন চরমে পৌঁছিল তখন আল্লাহ তাআলা মুসলমানদিগকে হিজরত করার নির্দেশ দিলেন। মুসলমানগণ যখন মক্কা ত্যাগ করিয়া মদীনায় যাওয়া আরম্ভ করিলেন তখন কাফেরগণ মক্কার চারিদিকে শূলের ব্যবস্থা করিয়া রাখিল। কোন মুসলমানকে মক্কা হইতে মদীনা যাইতে দেখিলেই ধরিয়া আনিয়া শূলে বিদ্ধ করিত। এই চরম অবস্থার মধ্যেও তাঁহারা হিজরত অব্যাহত রাখিলেন। সোবহানাল্লাহ ! কেমন তাঁহাদের মন বা আর কেমন মুসলমান !

সাহাবাগণ মদীনায় আগমন করার পর আর্থিক ও শারীরিক কষ্ট-ক্লেশের মধ্যে দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া হুযুর (সাঃ) খুব চিন্তিত হইয়া পড়িলেন এবং কি করা যায় সেই বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করিতে লাগিলেন।

হুযুর (সাঃ) মদীনাবাসীদিগকে সমবেত করিয়া এরশাদ করিলেন, যদি তোমরা চিন্তা–ভাবনা এবং পরামর্শ করিয়া উত্তর দাও তবে আমি তোমাদের নিকট একটি কথা বলিব।

সকলে একবাক্যে আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আপনার জন্য আমাদের পিতা-মাতা কোরবান হউক, এরশাদ করুন।

এরশাদ করিলেন, মক্কাবাসী মুসলমানদের জন্য আল্লাহ হিজরত ফরয করিয়াছেন। তাঁহারা আল্লাহর নির্দেশ পালনার্থ বাড়ী-ঘর, ধন-সম্পদ ছাড়িয়া রিক্ত হস্তে এখানে আসিয়াছেন। এখন তাহাদের জীবিকানির্বাহের কোন পথ খুঁজিয়া বাহির করা দরকার।

মদীনাবাসী সভাস্থল ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন এবং নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। প্রথমে তাঁহারা বলিলেন, আমাদের যাহা কিছু আছে সবই আমাদের মুহাজির ভাইদিগকে দান করিয়া দিব। তারপর আবার বলিলেন, আমাদের জীবিকানির্বাহের জন্যও কিছু রাখা দরকার। অতঃপর সকলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন যে, আমাদের সম্পত্তির অর্ধেক তাঁহাদিগকে দিব।

islamibookbd.wordpress.com

এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পর তাঁহারা হাসি-খুশী মুখে দরবারে নববীতে উপস্থিত হইয়া আরয করিলেন, আমরা সকলে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছি যে, আমাদের নিকট যাহা কিছু আছে উহার অর্ধেক আমাদের মুহাজির ভাইদিগকে দান করিব।

এই সিদ্ধান্তের পর আনসারগণ মুহাজিরদিগকে তাঁহাদের সম্পত্তির অর্ধেক দান করিলেন। সুতরাং স্মরণ রাখিও, তোমার অন্তর যদি অর্থ বুঝে তবে তুমি ইহার যথার্থতা বুঝিতে পারিবে যে, পৃথিবী ত্যাগ না করিলে কেহ পৃথিবীতে কৃতকার্য হইতে পারে না।

আল্লাহ তাআলা আনসারদের প্রশংসায় বলিয়াছেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا اَنْصَارَ اللّٰهِ كَمَا قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيّٖنَ مَنْ اَنْصَارِىْٓ اِلَى اللّٰهِ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ فَاٰمَنَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْ بَنِىْٓ اِسْرَآئِيْلَ وَكَفَرَتْ طَّآئِفَةٌ فَاَيَّدْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلٰى عَدُوِّهِمْ فَاَصْبَحُوْا ظٰهِرِيْنَ *

হে ঈমানদারগণ ! আল্লাহর সাহায্যকারী হও। যেমন মরিয়ম পুত্র ঈসা বলিয়াছেন, আল্লাহর কাজে কে আমার সাহায্যকারী হইবে ? হাওয়ারীরা বলিল, আমরা আল্লাহর কাজে সাহায্যকারী। বনী ইসরাঈলের একটি সম্প্রদায় ঈমান আনিল এবং আর একটি দল কাফের হইল। আমি ঈমানদারদিগকে তাহাদের শত্রুদের উপর সাহায্য করিয়াছি। ফলে তাহারা জয়যুক্ত হইল।

ঐ সময় যেব্যক্তি এক সের গম দিয়া মুহাজিরদিগকে সাহায্য করিয়াছেন, আজ অহুদ পরিমাণ স্বর্ণ দান করিলেও সেই পরিমাণ পুণ্য সঞ্চয় হইবে না। আনসারগণ

মুহাজিরদের জন্য যে ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন, তাহার তুলনা কোন দিন কোন মতেই হইতে পারে না। এই পুণ্যময় ত্যাগ তাঁহারা ব্যতীত আর কেহই স্বীকার করিতে পারে নাই। হুযুর (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন–

لو سلك الناس شعبا وسلكت الانصار شعبا سلكت شعب الانصار

লোকেরা যদি এক পথ অনুসরণ করে এবং আনসারগণ অন্য পথ অনুসরণ করে, তবে আমি আনসারদের পথই অনুসরণ করিব।

islamibookbd.wordpress.com

ষষ্ঠদশ মজলিস

পরিণাম

একুশে রবিউল আউয়াল, রবিবার। আমি দরবার শরীফে আরয করিলাম, লোকের পরিণতি কি হইবে এই সম্বন্ধে কেহ কিছু অবগত আছে কি ?

এরশাদ করিলেন, কাহার পরিণতি কি হইবে এই সম্বন্ধে কেহই কিছু অবগত নহে। কিন্তু যাহাদের সম্বন্ধে হুযুর (সাঃ) খোশখবর দিয়াছেন তাঁহারাই পরিণতি সম্বন্ধে অবগত। যেমন– সাহাবাদের মধ্যে দশ জনকে বেহেশতী হওয়ার সুসংবাদ দান করিয়াছেন। বেহেশতী হওয়ার সুসংবাদ পাওয়ার পরও তাঁহারা নির্ভয় ছিলেন না ; বরং তাঁহাদের আশা-নিরাশার কোন সীমা ছিল না।

বর্ণিত আছে, হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিতেন, আমি এতটা ভয় আর আশান্বিত যে, যদি কেয়ামতের দিন ঘোষণা করা হয়, আজ একজন ব্যতীত আর কেহই দোযখে যাইবে না, তবে আমি মনে করি সেই দোযখী আমি ব্যতীত আর কেহই নহে। আবার যদি বলা হয় যে, আজ একজন ব্যতীত আর কেহই জান্নাতী হইবে না। তবে আমি আশা করি সেই জান্নাতী আমি ছাড়া আর কেহ নহে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, পরিণাম কি হইবে সেই সম্বন্ধে কেহই অবগত নহে। এই বিষয়ে কেহ অবগত হইলে শয়তানেরও তাহার পরিণতি সম্বন্ধে জ্ঞান থাকিত। কারণ, সে ফেরেশতাদের ওস্তাদ ছিল ; সাত হাজার বৎসরের এবাদতের পুঞ্জি তাহার ছিল। তাহার আমল আরশের পাখার উপর রাখা ছিল।

যখন আল্লাহর দরবারে তাহাকে মরদুদ করা হইল, তখন তাহার কপালে লানতের টিকা পরাইয়া দেওয়া হইল। আল্লাহ এরশাদ করিলেন–

"নিঃসন্দেহে আমার লানত কেয়ামত পর্যন্ত তোমার উপর বর্ষিত হইবে।"

সেই মরদুদ মাথায় ধুলাবালি নিক্ষেপ করিতে করিতে বলিতেছিল–

দোজাহানের এমন কোন স্থান নাই যেখানে আমি সেজদা করি নাই। আমিই তো নিজের অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞাত ছিলাম। ইবলীসের ভাগ্যের কথা শুনিয়া তাহাকে লানত করিতাম আর নিজের এবাদতের জন্য শুকরিয়া আদায় করিতাম।

কিন্তু আজ আমি অপাদমস্তক পরিতাপে নিমজ্জিত ; সমগ্র জগতের জন্য উদাহরণযোগ্য। হঠাৎ বিষাদ স্রোত আসিয়া পড়িল, মাথায় আমার লানতের আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। আমি কি জানিতাম যে, আমার অভিশপ্ত জন আমি স্বয়ং। আমি ছাড়া সকলেই জ্ঞানী আর আমি উন্মাদ। এখন আমি জানিতে পারিলাম যে, হাজার হাজার বৎসর এবাদত-বন্দেগী করার পরও লানতের বেড়ি গলায় দেওয়া হইয়া থাকে।

ইহার পর মৃত্যু সম্বন্ধে বলিলেন, মৃত্যু এমন এক বস্তু যাহা সন্তানকে ইয়াতীম করে, পিতামাতাকে সন্তানহারা করে, ঘরবাড়ী উজাড় করে, রাজা-বাদশাহকে এক মুহূর্তে দিশাহারা করে।

হে মৃত্যু ! তুমি সর্বদা জীবনের উপর ডাকাতি কর। সন্তান-সন্ততি এবং ঘরবাড়ী ধ্বংস কর, যে রাজ্য গঠন করিতে হাজার বৎসর অতিবাহিত হয় তোমার কবলে পড়িয়া এক মুহূর্তে তাহা তছনছ হইয়া যায়। ওহে ! তুমি রাজ্যের মালিক, এই জন্য গর্বিত হইও না। যখন মৃত্যু আসিবে তখন তুমি তাহা ছাড়িয়া যাইবে। মৃত্যু এমন এক বস্তু, যে প্রতিদিন প্রতিটি মানুষকে নূতন চিন্তা-ভাবনায় নিপতিত করে। প্রত্যেকের অন্তরকে ক্ষত-বিক্ষত করে। ওহে ভাই ! মালাকুল মওত যখন উপস্থিত হন তখন বলেন–

"হে আল্লাহ ! তোমার এই বান্দার আত্মাকে নেক না বদ লোকের আত্মার ন্যায় কবয করিব ?"

জানি না আল্লাহ তখন ইহার উত্তর কি দেন। জানি না আমার ভাগ্যে কি লেখা হইয়াছে। আর ইহাও জানি না যে, পরিণতি কি হইবে ? আমার পুণ্যও ধ্বংস হইবে যদি তিনি তাহা গ্রহণ না করেন।

এক বুযুর্গ ছিলেন। কোন লোক তাঁহার নিকট গেলে তিনি বলিতেন, ওহে ভাই ! মৃত্যু ক্রয় করিতে যদি পাওয়া যায় তবে আমার জন্য লইয়া আসিবে। তাঁহার মৃত্যুক্ষণে লোকে জিজ্ঞাসা করিল, মৃত্যু আপনার কেমন মনে হইতেছে ?

তিনি বলিলেন, আমার মনে হইতেছে সপ্ত স্তর যমীন আমার নিচে এবং সপ্ত স্তর উপরে। আমাকে যেন উহার মধ্যে রাখিয়া পিষা হইতেছে।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে–

اَنَّ قَطْرَةً مِّنْ اَلَمِ الْمَوْتِ اَنَّ وُضِعَتْ عَلٰى جَبَلِ الْاَرْضِ

islamibookbd.wordpress.com

لَزَبَتْ كُلَّهَا -

মৃত্যু যন্ত্রণার এক ফোঁটা যদি পাহাড়ের উপর রাখা হইত তবে পাহাড় বিগলিত হইয়া যাইত।

বর্ণিত আছে, কেয়ামতের দিন শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়ার সাথে সাথে সমস্ত প্রাণী মৃত্যুবরণ করিবে। কিন্তু আযরাঈল (আঃ) জীবিত থাকিবেন।

আল্লাহ তাআলা জিজ্ঞাসা করিবেন, হে আযরাঈল ! কোন প্রাণী জীবিত আছে কি ?

আযরাঈল (আঃ) বলিবেন, আল্লাহ ! তুমি সর্বজ্ঞ ! আমি ব্যতীত আর কেহ জীবিত নাই।

আল্লাহ তাআলা এরশাদ করিবেন, এবার তোমার জান কবয কর। তখন তিনি মৃত্যু যন্ত্রণার ভয়ে এমনভাবে চিৎকার করিবেন যে, পৃথিবীর আদি হইতে শেষ পর্যন্ত যদি সমস্ত প্রাণী জীবিত থাকিত, তবে তাঁহার এই চিৎকারের যন্ত্রণায় সমস্ত প্রাণীর প্রাণ সংহার হইয়া যাইত।

বর্ণিত আছে, হুযুর (সাঃ)-এর যখন মৃত্যু যন্ত্রণা আরম্ভ হইল তখন তিনি এক পেয়ালা পানি আনাইয়া তাহাতে পবিত্র হাত ডুবাইয়া পবিত্র বুকে মালিশ করিতেছিলেন আর বলিতেছিলেন–

হে আল্লাহ ! আমার ও আমার উম্মতের জন্য মৃত্যু যন্ত্রণা সহজ করিয়া দাও।

ওহে ভ্রাত ! এখন বুঝিয়া দেখ, হুযুর (সাঃ) মাসুম হওয়া সত্ত্বেও মৃত্যু যন্ত্রণায় আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ করিয়াছেন, মালাকুল মওতকে নরম হওয়ার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন, তখন তোমার আমার অবস্থা কি ?

আমি আরয করিলাম, নবী, ওলী এবং অন্যদের মৃত্যু একই সমতুল্য কিনা?

এরশাদ করিলেন, মৃত্যুর বেলায় সকলেই সমান।

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ সকল প্রাণীকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু যন্ত্রণার মধ্যে পার্থক্য আছে। প্রত্যেকেই কার্যানুযায়ী মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করিবে।

কোন কোন শিশু দুই তিন দিন মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করে। ইহা তাহাদের মর্যাদার তারতম্যের জন্য হইয়া থাকে। কারণ, তাহারা দুনিয়ায় কোন প্রকার দুঃখের সম্মুখীন হয় নাই। আজ এখানে যাহারা কষ্ট ভোগ করিবে পরকালে তাহাদের উন্নততর মর্যাদা হইবে।

পিতা-মাতার যে ধর্ম শিশুদেরও সেই ধর্ম। যতদিন শিশু থাকিবে ততদিন মুসলমানের সন্তান হইলে মুসলমান এবং কাফেরের সন্তান হইলে কাফের বলিয়াই বিবেচিত হইবে। বালেগ হইলে ঈমান আনা তাহার পক্ষে ফরয। শিশু অবস্থায় সে হুকমী ঈমান রাখে, হাকীকী নহে। শরীয়তের আহকাম তাহার পক্ষে-ওয়াজিব নহে।

কোন মুসলিম শিশু শৈশবে মারা গেলে আমরা তাহাকে মুসলমান বলি। কারণ, তাহার পিতা-মাতার ঈমানই তাহার ঈমান। কাফেরের সন্তান তাহার পিতা-মাতার কুফরীর জন্য নিজেও কাফের হয়। কোন কাফের মুসলমান হইলে তাহার সন্তানদিগকেও আমরা মুসলমান বলি। কারণ, তাহার পিতা-মাতার ইসলামই তাহার ইসলাম।

মাতা-পিতার কুফরীর দরুন সন্তানও কাফের থাকে। পরকালের ব্যাপারে মতভেদ আছে। ইমাম আযম (রঃ) বলেন, শিশুকালে মৃত কাফেরদের শিশু সন্তানদের পরকাল সম্বন্ধে জানি না। ইমাম মুহাম্মদ এবং ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ) বলেন, কাফেরদের শিশু সন্তানদিগকে আরাফ নামক স্থানে রাখা হইবে। আরাফ বেহেশত ও দোযখের মধ্যবর্তী একটি স্থান। তাহাদের মধ্যে কুফরী নাই যে দোযখে যাইবে ; আর ইসলামও নাই যে বেহেশতবাসী হইবে। বরং দুইয়ের মধ্যবর্তী স্থান আরাফে থাকিবে।

আর এক মতে, তাহারা বেহেশতের গেলমান হইবে, বেহেশতাবাসীদের খাদেম হইবে।

তারপর বলিলেন, যাহার পরিণতি ভাল সে বিপদমুক্ত। দুনিয়ার যাবতীয় বিপদাপদ পরকালের বিপদাপদের তুলনায় একটি সরিষা সমতুল্যও নহে।

islamibookbd.wordpress.com

সপ্তদশ মজলিস

নফস

বাইশে রবিউল আউয়াল, সোমবার। নফসের দোষ সম্বন্ধে আলাপ- আলোচনা হইতেছিল।

পীর ও মুরশিদ এরশাদ করিলেন, আল্লাহ তাআলা নফসকে পয়দা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোর পরিচয় কি ? নফস বলিল-

اَنَا اَنَا اَنْتَ اَنْتَ আমি আমি, তুমি তুমি।

ইহার পর আল্লাহ তাআলা নফসকে অনাহারে রাখিয়া শাস্তি দিলেন। নফস ক্ষুধায় কাতর হইয়া পড়িল।

এইবার জিজ্ঞাসা করিলেন, তোর পরিচয় কি ?

নফস বলিল, اِلٰهِىْ اَنْتَ رَبِّىْ قَوِىٌّ وَاَنَا عَبْدُكَ ضَعِيْفٌ

খোদাওয়ান্দ ! তুমি আমার শক্তিশালী মালিক। আমি তোমার দুর্বল দাস।

এখন চিন্তা করিয়া দেখ যে, ক্ষুধা কেমন বস্তু। নাফরমানকেও আল্লাহর বন্দেগী করায়, তাঁহার সম্মুখে মাথানত করিতে বাধ্য করে। এই ধোঁকাবাজ নফস ক্ষুধার শাস্তি পাওয়া ব্যতীত আর কিছুতেই মাথানত করে না। আমাদের নফস ফেরআউনের অবাধ্য নফসের ন্যায় গর্বিত এবং মাথা উত্তোলন করিয়া দাঁড়ায়। কিন্তু ফেরআউনের নফস প্রকাশ্যভাবে বলিত- اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى আমি তোমার মহান প্রভু। আর আমাদের নফস অতি সংগোপনে বলে, আমি তোমাদের মহান প্রভু। আমিত্বের এই দাবী প্রত্যেক নফসই করিয়া থাকে। পার্থক্য এতটা যে, ফেরআউনের দাবী ছিল প্রকাশ্য। ইহার কারণ এই যে, ফেরআউন কাহাকেও ভয় করিত না। সেই যুগে তাহার চেয়ে প্রভাবশালী আর কেহ ছিল না যে তাহার

ক্ষতিসাধন করিতে পারে। তাই যাহা কিছু বলার সর্বজনসমক্ষে এবং প্রকাশ্যেই বলিত।

আল্লাহ তাআলা বলেন-

"হে নবীবর ! আপনি কি তাহাদের অবস্থা লক্ষ্য করেন নাই যাহারা তাহাদের নফসকে স্বীয় খোদায় পরিণত করিয়াছে।"

শয়তান সাত হাজার বৎসর খোদার এবাদত-বন্দেগী করিয়া পরিশেষে নফসের বান্দায় পরিণত হইল। আল্লাহর এবাদত পরিত্যাগ করিয়া নফসের তাবেদার হইল। আল্লাহ যখন তাহাকে বলিলেন, আদমকে সেজদা কর। তখন সে বলিয়া উঠিল, আমি আদমের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। তুমি আমাকে অগ্নি দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছ।

নফস তাহার উপর বিজয়ী হওয়ায় সে আল্লাহর হুকুমের অবাধ্য হইয়া আদমকে সেজদা করিল না, কাফের হইয়া গেল। কোরআন বলে, "সে গর্বভরে অস্বীকার করিয়া কাফের হইল।" নফসের একটি নির্দেশ পালন করিয়া হাজার হাজার বৎসরের সাধনা নষ্ট করিয়া ফেলিল। চিরকালের জন্য অভিশপ্ত হইয়া আল্লাহর দরবার হইতে বাহির হইয়া আসিল। হাজার হাজার বৎসর এবাদত করার পরও গলায় লানতের বেড়ি পরাইয়া দেওয়া হইল। তাহার কপালে কলঙ্কের টিকা এইভাবে লাগাইয়া দেওয়া হইল-

"আমার লানত তোমার উপর কেয়ামত পর্যন্ত থাকিবে।"

নফসে আম্মারাকে আয়ত্তে আনা এবং দুর্বল করার জন্যই সমস্ত বুযুর্গ রিয়াযত মুজাহাদার আগুনে দগ্ধ হইয়াছেন। নফসকে দমন ও ঘৃণিত করিয়া রাখার জন্যই তাঁহারা মোটা কম্বল আর খেরকা পরিধান করিতেন।

তাই যদি কোন সময় তুমি তোমার নফসের উপর ক্রোধ প্রকাশ কর তবে নফসের দোষ তোমা হইতে দূর হইয়া যাইবে। এই সময় নফসকে অগ্নিকুণ্ডের উপর রাখিয়া দাও। ফলে নফস সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হইয়া তোমার দেহ নূরের আলোকে আলোকিত হইয়া উঠিবে।

নফসকে দমন ও দুর্বল করার মানসেই আল্লাহর নবীগণ ক্ষুধার্ত থাকিতেন, দরিদ্রতা পছন্দ করিতেন। তাঁহারা নিষ্পাপ হওয়া সত্ত্বেও এক মুহূর্তের জন্যও নফস হইতে নির্ভয় থাকিতেন না। তাঁহারা আল্লাহর নিকট রাজত্ব বা ধন-সম্পদ কামনা

islamibookbd.wordpress.com

করিলে অবশ্যই পাইতেন। কিন্তু তাহা কামনা করেন নাই। রাজ্য ও সম্পদে মুক্তির আলো দেখেন নাই। বরং তাহাতে নফসের আধিপত্যই দেখিয়াছিলেন। তাহাতে মুক্তির চেয়ে বন্দীত্বকেই বেশী দেখিতে পাইতেন। দরিদ্রতা ও অনাহারে থাকার মধ্যেই মুক্তি ও পরকালে সফলকাম হওয়া নিহিত রহিয়াছে।

নফসের পূজা করা আমাদের জন্য নহে। আমরা এবং আমাদের মযহাব অন্য কিছু।

বর্ণিত আছে, স্বেচ্ছায় দরিদ্রতাবরণ ও অনাহারে থাকার অবস্থা এতটা ছিল যে, একাদিক্রমে দুই তিন দিন হুযুর (সাঃ)-এর ঘরে রান্নাবান্নার কোন ব্যবস্থা থাকিত না। আবার কখনও তৈলের অভাবে পবিত্র গৃহ প্রদীপের আলোকে আলোকিত হইত না।

আল্লাহর বান্দার উপর আল্লাহর পক্ষ হইতে যে বিপদ অবতীর্ণ হয়, আল্লাহ তাআলা সেই বিপদের মধ্যে মেহেরবানীর এক বিরাট ভাণ্ডার লুক্কায়িত রাখেন।

অবাধ্য নফসের বিরুদ্ধে শেকায়েত সম্বন্ধে সুলতানুল আরেফীন হযরত বায়েজীদ বোস্তামী হইতে একটি রেওয়ায়েত আছে, তিনি বলিতেন, কাল কেয়ামতের দিন আমি আল্লাহর নিকট দরখাস্ত করিব যে, হে খোদা ! আমাকে দোযখে প্রবেশ করার অনুমতি দাও। যে কাফের নফস দুনিয়ায় অন্তরের রক্ত প্রবাহিত করাইয়াছে, আজ আমি উহাকে ক্রোধের অগ্নি দ্বারা জ্বালাইয়া দিব।

বর্ণিত আছে, পাক পবিত্র-থাকা সত্ত্বেও হযরত সোলায়মান (আঃ) বলিয়াছিলেন, আমি আমার নফসকে পরীক্ষা করিয়া দেখিব, সে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন কিছুতে সন্তুষ্ট কিনা ? দেখিলেন, নফস স্বভাবে ঠিক একই আছে। তিনি ধারণা করিলেন, সমস্ত পৃথিবীর বাদশাহ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা হইতে নফস পিছপা নহে। তাই তিনি সীমাহীন বাদশাহী দ্বারাই নফসকে যাচাই করিতে চাহিয়া প্রার্থনা করিলেন–

হে আল্লাহ ! আমাকে এমন রাজত্ব দান কর যেন আমার পর আর কেহ তেমন বিশাল রাজত্বের অধিকারী না হইতে পারে। নিশ্চয়ই তুমি দানকারী।

এক বন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন, যদি নফসকে যাচাই করার উদ্দেশ্যই ছিল তবে "আমার পর আর কেহই যেন তেমন বিশাল রাজত্বের অধিকারী না হইতে পারে" বলার অর্থ কি ?

এরশাদ করিলেন, ইহার বহু প্রকার ব্যাখ্যা বর্ণিত আছে। কেহ বলেন, শুধু বাদশাহী চাহিলে পূর্ণ রাজত্ব হইত না। অর্থাৎ এমন রাজত্ব হইত যেখানে অন্যান্য রাজা-বাদশাহও থাকিত, একচ্ছত্র অধিপতি হইতে পারিতেন না। রাজ্যের অংশীদার থাকিলে ক্ষতি হয়, পূর্ণতা অবশিষ্ট থাকে না। অথচ তাঁহার ইচ্ছা ছিল পূর্ণভাবে নফসকে যাচাই করা। পূর্ণতার যাচাই পূর্ণতা দ্বারাই হইয়া থাকে, অংশ দ্বারা নহে।

আবার কোন কোন তাফসীরকার বলেন, বাদশাহী চাওয়ার অর্থ, তিনি খুব যুদ্ধপ্রিয় ছিলেন এবং যুদ্ধ ব্যতীত দেশ জয় লাভ করা যায় না। যুদ্ধ করার জন্য রাজত্ব কামনা করিয়াছিলেন। ফলে আল্লাহ তাঁহাকে সমগ্র পৃথিবীর একচ্ছত্র বাদশাহ করিয়াছিলেন।

হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর একহাজার স্ত্রী ছিলেন। প্রথম স্বামীর মৃত্যুর পর যাঁহাদিগকে বিবাহ করেন তাঁহাদের সংখ্যাই ছিল সাত শত। অবশিষ্ট তিন শত কুমারীর পাণি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এতসংখ্যক বিবাহ করার উদ্দেশ্য ছিল বহু সন্তান লাভের আশা। এই সন্তানগণই যেন তাঁহাকে যুদ্ধে সাহায্য করিতে পারে। বায়ু তাঁহার সিংহাসন বহন করিত। বহুদূর পর্যন্ত মানব সৈন্য ছড়াইয়া থাকিত। পরী, জ্বিন ও পক্ষীকুল পলক মেলিয়া এই সৈন্যবাহিনীকে সূর্য তাপ হইতে ছায়া দান করিত।

এই সৈন্যদের রসদপত্র ও অন্যান্য আসবাবপত্র দেও-দৈত্যগণ যথাস্থানে মুহূর্তের মধ্যে পৌঁছাইয়া দিত। সমুদ্র হইতে মণি-মুক্তা উঠাইয়া আনিত। সারা পৃথিবীতে হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর গোয়েন্দা বাহিনী নিয়োজিত ছিল। যেখানে যাহা কিছু শুনিত বা দেখিত তাহারা তাঁহার কর্ণগোচর করিত। আল্লাহ তাআলা বলেন–

"আমি প্রবাহিত বাতাস তাহার অধীনস্থ করিয়া দিয়াছিলাম। সে তাহার ইচ্ছানুযায়ী বাতাসকে পরিচালনা করিত।"

খোদা প্রেমিকদের সম্বন্ধে বর্ণিত আছে, একদিন এক কবুতর তাহার সঙ্গিনীর সাথে খেলা করিতেছিল। কিন্তু মাদী কবুতর সঙ্গী নর কবুতরটিকে তেমন আমল দিতেছিল না। অর্থাৎ খেলার প্রতি উহার কোন মনোযোগ ছিল না।

নর কবুতর বলিল, তোর জন্য কি দেশটি তছনছ করিয়া ফেলিব ?

islamibookbd.wordpress.com

গোয়েন্দা এই কথা শুনিতেছিল। সে হযরত সোলায়মান (আঃ)-কে এই সংবাদ দিল। পর দিন সকালে তিনি উক্ত কবুতরটিকে সংবাদ দিয়া দরবারে হাযির করিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, গতকাল তুমি তোমার সঙ্গিনীর সাথে খেলা করার সময় কি একথা বলিয়াছিলে যে, তোর জন্য কি দেশটা তছনছ করিয়া ফেলিব ? কবুতর বলিল, জি হাঁ ! বলিয়াছিলাম।

হযরত সোলায়মান (আঃ) বলিলেন, কিভাবে তুমি তছনছ করিবে বল।

কবুতর বলিল, হে আল্লাহর নবী ! প্রেমিকদের কথা শ্রবণ করা হয় এবং স্বাদ পাওয়া যায়।

এই উত্তর শুনিয়া হযরত সোলায়মান (আঃ) খুবই সন্তুষ্ট হইলেন এবং কবুতরটি উড়াইয়া দিলেন

আর একদিন হযরত সোলায়মান (আঃ) কোথাও যাইতেছিলেন। পিঁপড়ার বাদশাহ দেখিলেন হযরত সোলায়মান (আঃ) তাঁহার সেনাবাহিনী লইয়া আসিতেছেন। সে তাহার সঙ্গী-সাথীদিগকে বলিল, তোমরা পদদলিত হওয়ার পূর্বেই গর্তে চলিয়া যাও। আল্লাহ তাআলা বলেন–

"এমনকি পিঁপড়ারা ময়দানে আসিল, তখন এক পিঁপড়া বলিল, হে পিঁপড়াকুল! তোমরা তোমাদের গর্তে ঢুকিয়া পড়। অসাবধানতাবশত সোলায়মান এবং তাঁহার বাহিনী যেন তোমাদিগকে পদদলিত করিয়া না ফেলেন।"

সংবাদদাতা হযরত সোলায়মান (আঃ)-কে এই সংবাদ জ্ঞাপন করিল।

হযরত সোলায়মান (আঃ) বায়ুকে নির্দেশ দিলেন আমার সিংহাসন এখানে অবতরণ করাও। আর তোমরা স্ব স্ব কর্তব্য কাজ কর।

অতঃপর তিনি পিঁপড়ার গর্তের পাশে বসিয়া পড়িলেন। পিঁপড়ার বাদশাহ গর্ত হইতে বাহির হইয়া আসিয়া বলিল, হে আল্লাহর নবী ! বলুন, আল্লাহ আপনাকে কি কি বস্তু দান করিয়াছেন ?

হযরত সোলায়মান (আঃ) বলিলেন, সেই শ্রেষ্ঠ বাদশাহ আমাকে এমন সিংহাসন দান করিয়াছেন যে, উহার উপর চারি হাজার কুরসী বসানো আছে। প্রত্যেক কুরসীতে একজন আলেম বসিয়া ধর্মজ্ঞান শিক্ষা দেন। জ্বিন, ইনসান, দৈত্য, পশু-পাখী সব কিছু আমার আজ্ঞাধীন করিয়া দিয়াছেন। এমনকি বাতাস আমার কথামত পরিচালিত হয়। পিঁপড়া জিজ্ঞাসা করিল, বাতাস পরিচালনা করার

মধ্যে কি রহস্য আছে আপনি জানেন কি ?

হযরত সোলায়মান (আঃ) এই প্রশ্নে হতবাক হইয়া রহিলেন। পিঁপড়া বলিল, ইহারা সব বাতাসী দুর্গ, আপনার ক্ষমতাধীন কিছুই নহে।

এই পৃথিবীর গঠন যতই উচ্চ পর্যায়ের হউক না কেন, একদিন অবশ্যই ধ্বংস হইয়া যাইবে। দুনিয়ার সম্পদ ও রাজত্ব অর্থহীন। ইহা বরবাদী ব্যতীত আর কিছুই নহে।

বায়ু তাঁহার সিংহাসন একমাসের পথ একদিনে লইয়া যাইত আবার রাতে ফিরিয়া আসিত। যখন তিনি পানিবিহীন কোন স্থানে অবতরণ করিতেন তখন দৈত্য-দানবকে নির্দেশ দিতেন মাটি খুঁড়িয়া পানি বাহির করিতে। এই সমস্ত কিছু ধোঁকাবাজ নফসকে যাচাই করার জন্য ছিল। সমগ্র পৃথিবীর একচ্ছত্র অধিপতি হওয়া সত্ত্বেও তিনি নিজ হাতে খেজুর পাতার থলি তৈয়ার করিতেন এবং তাহা বিক্রয় করিয়া সন্ধ্যায় ইফতার করিতেন।

হযরত সোলায়মান (আঃ) সমগ্র পৃথিবীর অধিপতি হওয়া সত্ত্বেও দরিদ্রতার দরুন থলি তৈয়ার করিয়া জীবিকানির্বাহের পন্থা করিয়া লইয়াছিলেন। এইভাবে জীবন যাপন করিলেই এই দুনিয়া তোমার জন্য রহমতস্বরূপ হইবে। ধর্মের জন্যই দুনিয়াকে গ্রহণ কর।

বর্ণিত আছে, সমস্ত নবীর পর হযরত সোলায়মান ও ইউসুফ (আঃ) বেহেশতে প্রবেশ করার অনুমতি পাইবেন। কারণ, তাঁহারা বাদশাহীর প্রতি আসক্ত না থাকিলেও বাদশাহ ছিলেন।

তারপর বর্ণিত আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলিলেন, হযরত সোলায়মান (আঃ) বলিয়াছেন, "আমার পর যেন আর কাহারও এমন রাজত্ব না থাকে।" অর্থাৎ নবী ব্যতীত অন্য কেহ যেন এমন রাজ্যের অধিপতি না হয়। এমন প্রার্থনা অন্য কেহ করেন নাই। এমন বিস্ময়কর রাজ্য ও সিংহাসনের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও নফস তাঁহার উপর কোন প্রকার কর্তৃত্ব করিতে পারে নাই। আম্বিয়া ব্যতীত অন্যদের অবস্থা ইহার বিপরীত। কারণ, তাহারা নিষ্পাপ বা শয়তান ও নফসের ধোঁকা হইতে নিরাপদ নহে।

তাহারা যদি এমন বাদশাহীর অধিকারী হয় তবে অতি শীঘ্রই ধ্বংসের কূপে নিপতিত হইবে। তাই আল্লাহর সৃষ্টির নিরাপত্তার জন্য হযরত সোলায়মান (আঃ)

islamibookbd.wordpress.com

বলিয়াছিলেন, "আমার পরে যেন অন্য কেহ এমন বিশাল রাজ্যের অধিপতি না হয়।"

পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে বর্ণিত আছে, হযরত ইউসুফ (আঃ) এবং অন্যান্য বহু নবী হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর বংশধর ছিলেন। একমাত্র ইউসুফ (আঃ) ব্যতীত অন্যান্য সকল নবীকে কোব্বার মধ্যে কবর দেওয়া হইয়াছে। কারণ, হযরত ইউসুফ (আঃ) নবী থাকা সত্ত্বেও মিসরের বাদশাহ ছিলেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, "এমনিভাবে আমি পৃথিবীতে ইউসুফকে ক্ষমতাশালী করিয়াছিলাম যাহাতে সে তাহার ইচ্ছামত কাজ করিতে পারে। যাহাকে ইচ্ছা আমি আমার রহমতের অংশীদার করি। আমি এহসানকারীদের পারিশ্রমিক কম করি না।"

নফস এমনই খারাপ যে, আল্লাহর বিরোধিতা করিতে আরম্ভ করিয়া দেয়। আল্লাহ তাআলা বান্দাদিগকে বলেন, "আমার একত্ববাদ স্বীকার করিয়া আমার প্রশংসা কর, আমি ব্যতীত আর কাহারও উপাসনা করিও না এবং আমার নির্দেশ পালন কর।"

ঠিক তেমন নফস আদেশ করে, আমার প্রশংসা কর, আমার আদেশের বিরোধিতা করিও না এবং আমি ব্যতীত আর কাহারও সম্মুখে মাথা নত করিও না। প্রত্যেক ব্যক্তির নফসই এই দাবী করে। প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজেকে অন্যের চেয়ে বুযুর্গ মনে করে এবং বলে, আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কেহ নাই।

তৃপ্তি সহকারে আহার, অধিক পার্থিব ধন-সম্পদ সঞ্চয় এবং আরাম-আয়েশের কারণেই নফস আল্লাহর সমতুল্য হওয়ার দাবী করিয়া থাকে। যেমন– কথিত আছে, ফেরআউন যদি ক্ষুধার্ত থাকিত তবে খোদায়ী দাবি করার সাহস পাইত না। একমাত্র এই কারণেই বুযুর্গগণ ধোঁকাবাজ নফসের মনস্কামনা পূর্ণ হইতে দিতেন না। সুতরাং নফসানী যিন্দেগী হইতে নিরাপত্তার উদ্দেশেই তিনি তাঁহার বন্ধুদিগকে ক্ষুধার্ত রাখেন। আশ্চর্য যে, লুক্কায়িত কাফের নফস তবুও খোদায় দাবী করে। এই দুর্ভাগা কুকুর আমার সহিত সব কিছুই করে। সে এমন কিছু করে যাহা রোমী কাফেরও করে না।

নফস আয়ত্তে আসিয়াছে কিনা ইহা অবগত হইতে ইচ্ছা করিলে নিজের প্রতি লক্ষ্য করিবে। নিজের মধ্যে সামান্যতম গর্ব থাকিলেও বুঝিবে, তোমার নফস এখনও অবশিষ্ট রহিয়াছে। নিজেকে সাধারণ একটি কুকুরের চেয়েও ভাল মনে

করিলে গর্ব-অহংকার এখনও বাকী রহিয়াছে। যতদিন আত্মঅহংকার থাকিবে ততদিন নফসও জীবিত থাকিবে। নফস যতদিন থাকিবে বিপদও ততদিন থাকিবে। ইসলামের সৌন্দর্য অর্জন করা হইতে ততই দূরে থাকিবে। ইসলামে গর্ব ও অহংকারের স্থান কোথায়?

কোন কোন দরবেশনামা ব্যক্তি মনে করেন, আমি আল্লাহর মনোনীতদের একজন। কিন্তু সে জানে না, সারাজীবনের সঞ্চয় তাহার একমাত্র গর্ব ও অহংকার ব্যতীত আর কিছুই নহে।

যদি কোন ব্যক্তি নিজেকে রাস্তার কুকুরের চেয়েও অধম মনে করে তবে মানিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, সে তাহার নফসকে আয়ত্তে আনিতে সমর্থ হইয়াছে।

আল্লাহ ব্যতীত অন্যের পর্দা যখন মধ্যস্থল হইতে অপসারণ হইয়া যায় তখন সঠিক কথা এই হইয়া যাইবে যে, আমি মারেফাতের আসমানের চন্দ্রে পরিণত হইব। দেহ এবং প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করিতে যখন তুমি সক্ষম হইবে তখন তোমার যাহা কিছু থাকিবে তাহাই যথার্থ।

islamibookbd.wordpress.com

অষ্টাদশ মজলিস

রমযান মাসে মোমেনের মৃত্যু

তেইশে রবিউল আউয়াল, মঙ্গলবার। দরবার শরীফের ভক্তদের মধ্য হইতে মাওলানা মোয়াইয়েদ আরয করিলেন, হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, যেব্যক্তি পবিত্র রমযান মাসে মৃত্যুবরণ করে তাহার আযাব হয় না। কিন্তু বুঝিতে পারিলাম না, কেয়ামত পর্যন্ত যত রমযান আছে সব রমযান এই বাণীর শামিল কিনা ?

পীর ও মুরশিদ এরশাদ করিলেন, 'রওযাতুল ওলামা' কিতাবে বর্ণিত আছে, যে মোমেন রমযান মাসে মৃত্যুবরণ করে তাহার আত্মাকে বেহেশতে স্থান দেওয়া হয়।

মাওলানা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, পুণ্যবান এবং পাপীর মধ্যে কোন প্রকার তারতম্য আছে নাকি ?

এরশাদ করিলেন, পুণ্যবানদের বেলায় অবশ্য এরূপ হইবে। তবে পাপীদের বেলায় আল্লাহ ইচ্ছা করিলে বেহেশতে স্থান দিতে পারেন, অন্যথায় নাও দিতে পারেন।

আবার তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, বর্তমানে বেহেশতে কতজন লোক আছেন?

এরশাদ করিলেন, পুরুষদের মধ্যে হযরত ইদ্রীস (আঃ) এবং হাবীব নাজ্জার (রঃ)। মহিলাদের সম্বন্ধে মতভেদ রহিয়াছে। কেহ বলেন, মারইয়াম (আঃ) আবার কেহ বলেন ফেরআউনের স্ত্রী হযরত আছিয়া।

বর্ণিত আছে, হযরত আছিয়া আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল মূসা (আঃ)-এর প্রতি বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু তাঁহার ঈমান সম্বন্ধে কেহই অবগত ছিল না। যখন শিশু হযরত মূসা (আঃ)-কে প্রতিপালন করার জন্য ফেরআউনের গৃহে আনা হইল তখন হযরত আছিয়া বলিলেন, ইহাকে আমরা পুত্ররূপে গ্রহণ করিব। আশা করি শীঘ্রই সে আমাদের উপকারে আসিবে।

কেহ কেহ বলেন, এই উপকারের বিষয়বস্তু ছিল আল্লাহর প্রতি আছিয়ার ঈমান আনা। শিশু অবস্থায়ই হযরত মূসা (আঃ)-কে নবুয়ত দান করা হইয়াছিল।

হযরত মূসা (আঃ) যখন ইসলাম প্রচার করিতে আরম্ভ করেন তখন আছিয়া বলিলেন, ওহে ফেরআউন ! আল্লাহর একত্ববাদ ও মূসার নবুয়তের প্রতি ঈমান আন।

এই কথায় ফেরআউন ক্রোধান্বিত হইয়া আছিয়ার উপর অকথ্য নির্যাতন আরম্ভ করিয়া দিল। এই মালউনের কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা ছিল হাতে-পায়ে পেরেক মারিয়া মাটির সাথে গাঁথিয়া রাখা।

আছিয়ার মুখে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার কথা শুনিয়া ফেরআউন বলিল, আছিয়া, তুমি এই কাজ হইতে বিরত থাক এবং আমাকে আল্লাহ বলিয়া স্বীকার কর।

আছিয়া বলিলেন, অসম্ভব ! যিনি এই বিশ্বের প্রতিপালক তিনিই তোমার এবং আমার আল্লাহ।

ফেরআউন তাঁহার হাতে-পায়ে পেরেক মারিয়া বুকের উপর জ্বলন্ত আগুন রাখিয়া দিল। ইহাতেও যখন বিরত হইলেন না তখন তাঁহার বুকের উপর পাথরের পর পাথর দিয়া মারিয়া ফেলিল।

ধ্বংসের দরবারে জীবন সোপর্দকারী 'কেদাম' নামক স্থানের খেরকা পরিধানকারী একবার সাকীর দৃষ্টির সম্মুখে প্রেম শরবত পান করিল। সাকী ব্যতীত আর যাহা কিছু সবই সে পরিত্যাগ করিল।

তারপর মাওলানা জিজ্ঞাসা করিলেন, যেমন আছিয়া বলিয়াছিলেন, তেমনি হযরত ইউসুফ (আঃ) সম্বন্ধেও যোলায়খার স্বামী বলিয়াছিল–

عَسٰى اَنْ يَّنْفَعَنَا اَوْ نَتَّخِذَهٗ وَلَدًا আমরা তাহাকে পুত্রবৎ গ্রহণ করিব। আশা করি শীঘ্রই সে আমাদের উপকারে আসিবে।

আছিয়ার কি উপকার হইয়াছিল তাহা তো দেখিলাম। কিন্তু যোলায়খার স্বামীর কি উপকার হইয়াছিল ?

এরশাদ করিলেন, অনুপকার তো হয় নাই। কিন্তু উপকার সম্বন্ধে কোন কিছু কিতাবে নাই ?

islamibookbd.wordpress.com

মাওলানা বলিলেন এই উপকার হইতে পারে যে, যোলায়খা তাঁহার নিকট প্রেম নিবেদন করিতেন আর তিনি প্রত্যাখ্যান করিয়া তাঁহাকে দূরে সরাইয়া রাখিতেন এবং বলিতেন, যোলায়খা ! তোমার লজ্জা হয় না যে, তোমার স্বামী আমাকে পুত্রবৎ গ্রহণ করিয়াছেন।

এরশাদ করিলেন, ইহাও হইতে পারে। কিন্তু যোলায়খার ঘটনা তো ঐ পর্যন্ত যতদিন পর্যন্ত সে পর-স্ত্রী ছিল। তাহার নফসানী কামনা ছিল। কিন্তু যখন তাহাকে আপন আয়ত্তে লইয়া আসিলেন তখন উভয়ের মধ্যে নফসানী কামনা শেষ হইয়া রূহানী সম্পর্ক স্থাপিত হইল।

হযরত ইউসুফ (আঃ) তাঁহার পবিত্রতা বজায় রাখিলেন। যোলায়খা নাফরমানী করিল। তিনি শাহী ফরমান পাইলেন। পূত-পবিত্র চরিত্রের অধিকারী ইউসুফ (আঃ)-এর উপর সে দোষারোপ করিল। ইহার ফলে যোলায়খার স্বামীর বাদশাহী ধ্বংস হইয়া গেল এবং রাস্তার ফকীরে পরিণত হইল।

মাওলানা জিজ্ঞাসা করিলেন, পরকালে সকলেই যৌবন লাভ করিবে। যোলায়খাও কি যৌবন লাভ করিবেন ?

এরশাদ করিলেন, পরকালে সকল মোমেন ও মোমেনা দুইটি সৌন্দর্যের অধিকারী হইবে। একটি স্বীয় কাজের প্রতিদান, দ্বিতীয়টি আল্লাহর দয়ার দান। যোলায়খা মোমেনা। সুতরাং সেও সৌন্দর্যের অধিকারিণী হইবে।

অন্যত্র দেখিয়াছি, পরকালে একমাত্র যোলায়খা ব্যতীত অন্য সকল রমণীই সৌন্দর্যের অধিকারিণী হইবে। কারণ, যোলায়খা এই দুনিয়ায়ই তাহার যৌবন চাহিয়া লইয়াছিল। কিন্তু হুর খোদার দান এক বিস্ময়কর সৌন্দর্যের অধিকারিণী হইবে।

ইহার পর বলিলেন, আল্লাহ সৌন্দর্যকে পছন্দ করেন। হুযুর (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন–

"আল্লাহ সৌন্দর্যময় ; তিনি সৌন্দর্যকে পছন্দ করেন।" বর্ণিত আছে, হযরত ইউসুফ (আঃ) সীমাহীন সৌন্দর্যের অধিকারী ছিলেন। মিসরের দুর্ভিক্ষে লোকের অনাহারে থাকার সংবাদ যখন তাঁহার কর্ণগোচর হইল, তিনি নির্দেশ দিলেন, ঘোষণা করিয়া দাও, লোকেরা যেন প্রতিদিন শহরের বাহিরে একত্র হয় এবং আমার সৌন্দর্য

দেখিয়া তৃপ্ত হইয়া ফিরিয়া যায়। হযরত ইউসুফ (আঃ) সমবেত জনতার সম্মুখে স্বীয় পর্দা উঠাইয়া দিতেন এবং তাহাদিগকে তৃপ্ত হওয়ার সুযোগ দান করিতেন। যেব্যক্তি তাঁহাকে দেখিত সারাদিন সে আর ক্ষুধা অনুভব করিত না।

অন্তরের শান্তির সাথে এক নজর সুন্দর চেহারা দর্শন করা রাজ মুকুটের চেয়েও মূল্যবান। ইহা সারাজীবন স্মরণ রাখার জন্য যথেষ্ট।

অতঃপর মাওলানা বলিলেন, লোকে হুযুর (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি বেশী সুন্দর না ইউসুফ (আঃ)।

হুযুর (সাঃ) এরশাদ করিলেন– ভাই ইউসুফ সুশ্রী আর আমি সুন্দর।

তারপর পীর ও মুরশিদ বলিলেন– হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর সৌন্দর্য ছিল চরম পর্যায়ের। কাফের সম্প্রদায় সময় অসময় বনী ইসরাঈলের উপর আক্রমণ করিত, তাই তাহারা ইউসুফ (আঃ)-এর তাবুত কাবীস পাহাড়ে লইয়া যাওয়ার মনস্থ করে। কিন্তু দিনের বেলা লইয়া যাওয়া অসুবিধাজনক ছিল। তাই রাতের অন্ধকারে মাটি খুঁড়িয়া তাবুত বাহির করিল এবং তাঁহার শবদেহের সৌন্দর্যের আলোতে পথ দেখিয়া কাবীস পাহাড়ে আসিয়া পৌঁছিল। এখানে হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর বংশধরদের কবর ছিল। যেহেতু তিনি বাদশাহ ছিলেন তাই তাঁহার তাবুত কোব্বায় দাফন না করিয়া কাবীস পাহাড়ে দাফন করিল।

islamibookbd.wordpress.com

ঊনবিংশ মজলিস

দোযখের উত্তাপ

চব্বিশে রবিউল আউয়াল, বুধবার। দোযখ, শীত ও গরম বাতাসের কথা বলা হইতেছিল। হযরত পীর ও মুরশিদ বলিলেন, দোযখের দুইটি শ্বাসের দরুন এই উত্তাপ। আল্লাহই জানেন দোযখের গরম কত ভয়াবহ।

কোন কোন কিতাবে বর্ণিত আছে, দোযখের আগুন আল্লাহর নিকট ক্রন্দন করিয়া ফরিয়াদ করিল,

হে প্রভু ! আমার একাংশ অন্যাংশকে খাইয়া ফেলিল। ইহার পর উহার জন্য বৎসরে দুইটি শ্বাস ছাড়িবার ব্যবস্থা করিলেন। এক শ্বাস গরমের সময় অন্য শ্বাস শীতের সময়। উহার গরমের শ্বাস হইতেই আমরা গরম এবং শীতের শ্বাস হইতে শীত অনুভব করিয়া থাকি।

যদিও বাতাস তিন প্রকার। কিন্তু বর্ষা কৃত্রিম। বৃষ্টি হইলেই বর্ষা হয়। বৃষ্টি না হইলে গরম থাকে। সুতরাং শীত ও গরমই মওসুম।

দুর্বলচেতা মানুষ দোযখের একটি শ্বাস সহ্য করিতেই অক্ষম। দোযখের সম্পূর্ণ আযাব কিভাবে সহ্য করিবে ? দোযখের আযাব ভয়ঙ্কর কঠিন। মানুষ যতই এবাদত-বন্দেগী করুক না কেন, উহার ফলস্বরূপ সে কখনও দোযখের শাস্তি হইতে রেহাই পাইবে না। কিন্তু আল্লাহ অসীম দয়ালু, এই যা আশা-ভরসা।

তোমার মেহেরবানী যদি আমার জন্য কার্যকর হয় তবেই আমি মুক্ত। আর যদি আযাব প্রদান কর তবে লজ্জার আর সীমা থাকিবে না।

দোযখ সম্বন্ধে আল্লাহর রাসূল এরশাদ করিয়াছেন–

"দোযখে সত্তর হাজার ময়দান। প্রতি ময়দানে সত্তর হাজার গহ্বর, প্রতি গহ্বরে সত্তর হাজার সাপ এবং সত্তর হাজার বিচ্ছু। ইহার প্রতিটি স্থানে শাস্তি পাওয়া ব্যতীত কাফের ও মোনাফেকদের গত্যন্তর নাই।"

দোযখের সর্বনিম্ন আযাব হইল, পাপীর পায়ে এক জোড়া আগুনের জুতা পরিধান করাইয়া দেওয়া হইবে। উহার উত্তাপেই মাথার মগজ টগবগ করিতে থাকিবে। হুযুর (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন–

দোযখের নিম্নতম আযাব হইবে এক জোড়া অগ্নি পাদুকা পরাইয়া দেওয়া। যাহার উত্তাপে মাথার মগজ টগবগ করিয়া ফুটিতে থাকিবে।

ইহা দ্বারা অনুমান কর যে, ভীষণতর আযাবের রূপ কেমন হইবে ? দোযখের আযাব সম্বন্ধে যদি তোমার কোন প্রকার ভ্রান্ত ধারণা থাকে তবে তোমার একটি আঙ্গুল আগুনের মধ্যে রাখিয়া উহাকেই দোযখের আগুন মনে কর। পরকালের আগুনের সম্মুখে দুনিয়ার আগুনের কোন অস্তিত্বই নাই।

কারণ, দুনিয়ার আগুনকে রহমত দ্বারা সত্তরবার ধৌত করা হইয়াছে। হুযুর (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন–

পৃথিবীর আগুনকে রহমতের পানি দ্বারা সত্তর বার ধৌত করা হইয়াছে।

হযরত ঈসা (আঃ) বলিয়াছেন, কেয়ামতের দিন বহু সুস্থ-সবল, সুন্দর এবং মিষ্টভাষী লোক অগ্নির উত্তাপে ক্রন্দন করিতে থাকিবে।

হযরত দাউদ (আঃ) বলিতেন, প্রভু ! সূর্য তাপই তো সহ্য করিতে পারি না, দোযখের গরম কিভাবে সহ্য করিব। তোমার রহমতের আওয়ায সহ্য করার ক্ষমতা নাই। অতএব আযাবের আওয়ায কিভাবে সহ্য করিব ?

বিশ্বাস কর, আল্লাহ তাআলা অগ্নিকে খুবই ভয়াবহ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। তোমার এবং আমার অক্ষমতার জন্য খুবই দুঃখ। জানি না আমাদের ভাগ্যে কি আছে ?আমার এই চিন্তা-ভাবনায় সীমাহীন গভীর পেরেশানী দিন-রাত আমার উপর বিস্তার করিয়া আছে। হায় ! আমার পরিণতি কি হইবে ?

এই সমস্ত আযাব হইতে যদি রক্ষা পাইতে চাও তবে নেক আমল কর, সৎকাজ কর এবং সর্বদা সৎ পথে চলার চেষ্টা কর। মনে রাখিও, ইহাই তোমার মুক্তির পথ হইবে। এবাদত-বন্দেগী এবং সৎ কাজ এত বেশী পরিমাণ কর যে, তুমি পুণ্যাত্মাদের মধ্যে পরিগণিত হও। কারণ–

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ * وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ *

নিশ্চয়ই নেক লোক বেহেশতী এবং বদ লোক জাহান্নামী।

নেককারদের আমল আল্লাহ নষ্ট করেন না। আল্লাহ তাঁহার পবিত্র বাণীতে বলেন ঃ

إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ

"আল্লাহ এহসানকারীদের পারিশ্রমিক নষ্ট করেন না।"

islamibookbd.wordpress.com

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, যে মোমেন পাপের বোঝা লইয়া আল্লাহর দরবারে যায়, আল্লাহ তাহার সাথে তিনটি কাজের একটি করেন। তাহাকে মেহেরবানী করিয়া ক্ষমা করেন অথবা নবীর শাফায়াতে রেহাই দেন অথবা পাপ পরিমাণ শাস্তি দিয়া জান্নাতী করেন।

তুমি পাপী, তাহাতে কি হইল? তওবার দরজা তো উন্মুক্ত। তওবা কর তওবার দ্বার বন্ধ হওয়ার পূর্বেই। প্রশান্ত মন লইয়া যদি তুমি তাঁহার দরবারে আস তবে চিরোজ্জ্বল হাকীকত তোমার সম্মুখে আসিয়া পড়িবে। সুন্নত আল-জামাআতের মতে, কুফরী ব্যতীত সকল পাপই ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে। আল্লাহ তাআলা বলেন–

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ *

"আল্লাহ তাআলা অংশীবাদিতার পাপ ক্ষমা করেন না। ইহা ব্যতীত যাবতীয় পাপ তিনি ইচ্ছা করিলে ক্ষমা করিয়া দিতে পারেন।"

আল্লাহ বলেন, ফিরিয়া আস। আমি তো দরজা খুলিয়া রহিয়াছি। তুমি সাহস করিয়া অগ্রসর হও, আমি তোমার জন্য দণ্ডায়মান আছি। প্রেমের সাথে কাজ আদায় কর, দেখ প্রেমের কি কুদরত। কোন কিছুর পরোয়া করিও না। ইহার সব কিছু রহমত দ্বারা হইয়া থাকে। সকল লোকই যদি নামাযী হইত তবুও প্রেমের রহস্য অবগত হইত না। হেকমতের মনযিল রহমত দ্বারা অতিক্রান্ত করা যায়। সর্বক্ষণ তাঁহার দয়ারই প্রয়োজন হয়।

আল্লাহ তাআলা শিরকের পাপ ক্ষমা না করার কথা ঘোষণা করিয়াছেন। অন্যান্য যাবতীয় পাপ ক্ষমা করা তাঁহার ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। সগীরা এবং কবীরা পাপ নহে। সগীরা এবং করীরা গুনাহ ক্ষমা করা তাঁহারই ইচ্ছাধীন। তাঁহার নিকট ক্ষমা পাওয়ার আশাই রাখিবে। নিরাশ কখনও হইবে না। গরীব হও, নিঃসম্বল হও, মুশরিক তো নও। তিনি ভরসা দিয়া নিরাশ করেন নাই। এক বন্ধু বলিয়াছেন, সেই দরবারের রহমতের জন্য যদি তোমার নিকট কোন কিছু না থাকে আর অবস্থা এই হয় যে, তোমার চেয়ে দুর্বল আর কেহ নাই, তবু পরোয়া করিও না। যদি তাঁহার দরবারে বৈরাগ্য এবং পরহেযগারীর কোন মূল্য থাকে তবে দুর্বল বান্দার দুর্বলতাও ক্রয় করা হয়।

বিংশ মজলিস

মহব্বত

পঁচিশে রবিউল আউয়াল, বৃহস্পতিবার। আমরা অনেকেই হুজ্জাতুল ইসলামের দরবারে উপস্থিত ছিলাম। তিনি বিশেষ কোন কারণে তখনও দরবারে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। মহব্বত বা খোদা প্রেম সম্বন্ধে আমরা আলাপ-আলোচনা করিতেছিলাম। এমন সময় তিনি দরবারে উপস্থিত হইয়া সকলকে সালাম করিলেন। আমরা সকলেই সালামের উত্তর দিয়া চুপ করিয়া রহিলাম। তিনি সকলের দিকে চাহিয়া হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, দরবেশগণ কি সম্বন্ধে আলাপ করিতেছিলেন? আমি বলিলাম, খোদা প্রেম সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা হইতেছিল।

তিনি এরশাদ করিলেন, ভাইসব! খোদা প্রেম বা মহব্বতের সাতটি সোপান বা স্তর রহিয়াছে। ইহার সর্বপ্রথম স্তর হইল বিপদে ধৈর্যাবলম্বন করা। অর্থাৎ বন্ধুর পক্ষ হইতে যে বিপদ অবতীর্ণ হয় তাহা প্রশান্ত চিত্তে বরণ করিয়া ধৈর্যাবলম্বন করা।

হুযুর (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, মহব্বত এমনই একটি স্তর যেখানে শুধু ঐ সমস্ত প্রেমিকই পদ স্থাপন করিতে পারেন যাহারা বন্ধুর মহব্বত ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পান না। সাথে সাথে অন্যান্য যাবতীয় কিছু হইতে দূরে সরিয়া থাকেন।

একবার হযরত বায়েজীদ বোস্তামী (রঃ) প্রেমের জগতে বন্ধুর দরবারে একাকী উপবিষ্ট ছিলেন। আল্লাহ তাআলা জিজ্ঞাসা করিলেন, বায়েজীদ! বন্ধু বন্ধুর সাথে সাক্ষাত করিতে আসিলে নিশ্চয়ই কিছু লইয়া আসে। তুমি আমার জন্য কি উপঢৌকন আনিয়াছ?

হযরত বায়েজীদ (রঃ) বিনীতভাবে আরয করিলেন, মহব্বত এবং তোমার সন্তুষ্টি। তোমার বন্ধুগণ বলেন, এই দুইটি বস্তুই নাকি তোমার পছন্দনীয়।

আল্লাহ তাআলা এরশাদ করিলেন, উপঢৌকনস্বরূপ তুমি উপযুক্ত বস্তুই সাথে লইয়া আসিয়াছ, ইহা আমার খুবই পছন্দনীয়।

islamibookbd.wordpress.com

একবার হযরত রাবেয়া বসরী আল্লাহর দরবারে বার বার সেজদা করিতেছিলেন আর বলিতেছিলেন, হে মাবুদ ! আমি যদি দোযখের ভয়ে তোমার এবাদত-বন্দেগী করি তবে আমাকে দোযখের অতল তলে নিক্ষেপ করিও। আর যদি বেহেশতের লোভে তোমার অরাধনা-উপাসনা করি তবে বেহেশত আমার জন্য হারাম করিয়া আমাকে দোযখের ইন্ধন করিও। আর যদি তোমার মহব্বতে তোমার জন্যই এবাদত করি তবে পরকালে তোমার দর্শন লাভ হইতে আমাকে বঞ্চিত করিও না।

তিনি বলিলেন, যেব্যক্তি লোভ-লালসার মোহে পতিত হইয়া স্বীয় অন্তকরণকে নিষ্প্রভ করে, তাহাকে লানতের কাফন পরিধান করাইয়া লজ্জার যমীনে সমাধিস্থ করা হয়। খোদা প্রেমিক একমাত্র খোদা ব্যতীত অন্য আর কোন কিছুতেই শান্তি পাইতে পারেন না। খোদা প্রেমিক যতক্ষণ পর্যন্ত লোক সংস্রব পরিত্যাগ না করে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রেমাস্পদের নৈকট্যলাভে সমর্থ হয় না। বন্ধুকে শত্রু, পরিবার-পরিজনকে ইয়াতীম মনে না করা পর্যন্ত বন্ধুর সান্নিধ্য লাভ হইতে বঞ্চিত থাকে।

তারপর তিনি এরশাদ করিলেন, খোদা প্রেম ও খোদা-ভীতি এই দুইটি বিষয় ওতপ্রোতভাবে জড়িত। একটি ব্যতীত অন্যটি সাধন হয় না। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে- "যাহার মধ্যে আল্লাহর ভয় নাই সে মুসলমান নহে। তাই যে খোদাভীরু সে-ই প্রকৃত মুসলমান।" যেব্যক্তি রোযা রাখার জন্য কম খায় ; নামায পড়ার জন্য কম কথা বলে এবং এবাদত করার জন্য কম ঘুমায়, সে-ই খোদাভীরু। এই তিনটি গুণ যাহার মধ্যে নাই, সে কখনও খোদাভীরু হইতে পারে না।

দরবেশের মধ্যে ইহা ব্যতীত আরও তিনটি গুণ বেশী থাকিতে হইবে। প্রথম- ভয়। অন্তরে ভয় থাকিলে পাপ হইতে বিরত থাকা যায় এবং দোযখের আগুন হইতে মুক্তি পায়। দ্বিতীয়- খোদার প্রতি সন্তুষ্টি। ইহা এবাদত-বন্দেগী করিতে লোককে উৎসাহ দান করে, আসক্তি জন্মায়। ফলে উচ্চ মর্যাদা এবং বেহেশত প্রাপ্ত হয়। তৃতীয়- মহব্বত। অর্থাৎ খারাপ কাজ পরিতাগ করা। ইহাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা যায়।

খোদার ভয়ে এক যুবকের দেহ অস্থিসর্বস্ব হইয়া পড়িয়াছিল। যুবক এশার নামাযের পর গলায় রশি লাগাইয়া নিজেকে কড়ি কাঠের সাথে বাঁধিতেন এবং সারারাত দাঁড়াইয়া আল্লাহর নিকট কান্নাকাটি করিতেন আর বলিতেন, হে আমার

আল্লাহ মহান ! কেয়ামতের দিন যখন আমার অগণিত পাপ লোকের সম্মুখে প্রকাশ করা হইবে তখন আমি কিভাবে মুখ দেখাইব ?

কিছুদিন পর তিনি অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। তিনি বালিশের পরিবর্তে এক খণ্ড ইট মাথার নিচে দিয়া শুইয়া বৃদ্ধা মাতাকে ডাকিয়া বলিলেন, মা ! আমি মৃত্যুবরণ করিলে আমার গলায় রশি বাঁধিয়া বাড়ীর চারিদিকে ঘুরাইবেন এবং বলিবেন, এই ব্যক্তি তাহার মহান প্রভু হইতে পালাইয়া ফিরিত, তাই সে এইরূপ শাস্তি পাওয়ার যোগ্য। দ্বিতীয়ত- আমার জানাযা রাতের অন্ধকারে বাহির করিবেন যেন লোকে না দেখে। কারণ, যে দেখিবে সে-ই আমার কথা স্মরণ করিয়া পরিতাপ করিবে। তৃতীয়ত- আমাকে দাফন করার পর আপনি আমার কবরের পাশে বসা থাকিবেন। হয়ত আপনার পদধূলির বরকতে আল্লাহ আমার শাস্তি কমাইয়া দিতে পারেন।

যুবকের মৃত্যুর পর মা তাহার গলায় রশি লাগাইতে উদ্যত হইতেই আওয়ায হইল, হে বৃদ্ধা ! আমার বন্ধু আমার সান্নিধ্যে পৌঁছিয়া গিয়াছে। আল্লাহর বন্ধুর সাথে কি কেহ এমন ব্যবহার করে ? সে আমার বন্ধু, আমি তাহাকে ক্ষমা করিয়াছি।

একজন বুযুর্গ আল্লাহর ভয়ে এত ক্রন্দন করিতেন যে, চোখের পানি পড়িতে পড়িতে তাঁহার গালের চামড়া এবং গোশত উধাও হইয়া গিয়াছিল। লোকে বলে, তাঁহার গোশতবিহীন গালে টুনটুনি পাখি বাসা বাঁধিয়াছিল। অথচ তিনি আল্লাহর ভয়ে এত ভীত-সন্ত্রস্ত ছিলেন যে, পাখির আসা যাওয়ার কোন খবরই রাখিতেন না।

তিনি যখন কেয়ামত ও কবরের ভীষণ অবস্থার কথা শুনিতেন তখন ভয়ে মাছের ন্যায় ছটফট করিতেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তাঁহার এই অবস্থা ছিল।

অতঃপর পীর ও মুরশিদ তাওয়াক্কোল বা আল্লাহর প্রতি ভরসা রাখা সম্বন্ধে এরশাদ করিলেন, জ্ঞানবান ব্যক্তিগণ যেকোন অবস্থায় আল্লাহর উপর ভরসা করিয়া থাকেন। অন্যের প্রতি তাহাদের কোন ভরসা থাকে না। আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

এবং তাঁহারই উপর মোমেনদের ভরসা করা উচিত।

islamibookbd.wordpress.com

একবার হযরত রাবেয়া বসরী হজ্জ করার উদ্দেশে একটি গাধায় আরোহণ করিয়া মক্কার পথে রওয়ানা হন। এক নির্জন মরুভূমিতে পৌছার পর তাঁহার একমাত্র বাহন গাধাটি মারা যায়। ফলে তাঁহার আসবাবপত্র এদিক-সেদিক ছড়াইয়া পড়িয়া থাকে।

সে পথে এক কাফেলা মক্কায় হজ্জ করিতে যাইতেছিল। তাহারা হযরত রাবেয়াকে চিনিতে পারিল এবং তাঁহার অসহায় অবস্থা দেখিয়া কিছুসংখ্যক লোক আসিয়া বিনীতভাবে বলিল, আপনি যদি অনুমতি দেন তবে আমরা আপনার আসবাবপত্র আমাদের বাহনে উঠাইয়া লই এবং আপনিও আমাদের সাথে চলুন।

হযরত রাবেয়া গর্জিয়া বলিলেন, আমি তোমাদের উপর ভরসা করিয়া বাড়ী হইতে বাহির হই নাই। আমি যাঁহার উপর ভরসা করিয়া গৃহত্যাগ করিয়াছি তিনি আমাকে সেখানে পৌছার ব্যবস্থা করিয়া দিবেন।

কাফেলা চলিয়া গেল।

হযরত রাবেয়া তখন আকাশের দিকে মুখ তুলিয়া বলিলেন, হে আল্লাহ! আমি কি লোকের উপর ভরসা করিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছিলাম যে, তুমি আমার সাহায্যার্থ লোক পাঠাইয়াছ? তুমিই তো আমার একমাত্র ভরসার পাত্র। সুতরাং জনমানবহীন এই মরুভূমিতে তুমি কেন আমাকে এই বিপদে ফেলিলে?

তাঁহার মুখের কথা শেষ না হইতেই মৃত গাধাটি গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। হযরত রাবেয়া গাধার পিঠে মালপত্র উঠাইয়া রওয়ানা হইলেন।

যোহরের আযান হইল। সকলে উঠিয়া মসজিদে রওয়ানা হইলাম।

একবিংশ মজলিস

পাপী বান্দা – দয়ালু আল্লাহ

ছাব্বিশে রবিউল আউয়াল, শুক্রবার। আমি আরয করিলাম, হুযুর (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন–

نَصِيْبُ أُمَّتِىْ مِنْ نَّارِ جَهَنَّمَ كَنَصِيْبِ خَلِيْلِ مِنْ نَّارِ نَمْرُوْدَ

দোযখের আগুনে আমার উম্মতের ভাগ্য এমন যেমন নমরুদের অগ্নিতে ইবরাহীম খলীল (আঃ)-এর ভাগ্য প্রসারিত হইয়াছিল।

হযরত পীর ও মুরশিদ বলিলেন– কেয়ামতের দিন পাপী উম্মতদিগকে পাপ হইতে পবিত্র করার জন্য দোযখে শাস্তি দেওয়া হইবে। যেমন নমরুদের অগ্নি দ্বারা হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর অপ্রশস্ততা ইত্যাদি প্রশস্তরূপে পাওয়ার ভাগ্য হইয়াছিল। ঠিক তেমনি দোযখের শাস্তিতে পাপী মোমেনদের পাপ দূর হইয়া যাইবে। এই পাপ বেহেশতে প্রবেশ হওয়ার পক্ষে অন্তরায় বা বাধাস্বরূপ। মোমেনের প্রতি এই আযাব ফযীলতের আযাব, ক্রোধের আযাব নহে।

যেখানে আল্লাহর মেহেরবানী বিদ্যমান সেখানে পাপ কি করিতে পারে? এই উম্মতকে উম্মতী ফযলী বা মর্যদাসম্পন্ন উম্মত বলা হয়। আল্লাহ তাআলার অনন্ত-অসীম মেহেরবানী এই উম্মতের উপর। পূর্ববর্তী উম্মতদের উপর আল্লাহর এতটা মেহেরবানী ছিল না।

পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণ নিজ নিজ দেশবাসীকে ইসলাম গ্রহণ করার আমন্ত্রণ জানাইতেন। কেহ ইসলাম গ্রহণ করিয়া মুসলমান হইত আবার কেহ কাফেরই থাকিয়া যাইত। এই মুসলমানই তাহাদের নবীর মৃত্যুর পর ইসলাম ত্যাগ করিয়া কুফরীতে ফিরিয়া যাইত। ইহা হইতেই প্রমাণিত হয় যে, এই উম্মতের প্রতি আল্লাহর যতটা মেহেরবানী, পূর্ববর্তী উম্মতদের উপর ততটা ছিল না।

তুমি কি লক্ষ্য করিয়া দেখ নাই যে, যেদিন আমাদের প্রিয় নবীর নিকট অহী

islamibookbd.wordpress.com

অবতীর্ণ হইল এবং দ্বীন ইসলাম প্রচার করার নির্দেশ দেওয়া হইল, সেদিন হইতে তাঁহার আমন্ত্রণে দলে দলে লোক ইসলাম গ্রহণ করিয়া মুসলমান হইতে আরম্ভ করিল।

ইহার পর শত শত বৎসর চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু মনে হয় তিনি যেন আজও আমাদের মধ্যে বিদ্যমান। এমনিভাবে কেয়ামত পর্যন্ত মুসলমানের সংখ্যা বাড়িতেই থাকিবে। হুযুর (সাঃ)-এর জীবদ্দশায় মাত্র কয়েক হাজার লোক ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। আর আজ পৃথিবীর সর্বত্র ইসলাম ধর্মের পতাকা উড্ডীন হইয়াছে। উম্মতে মুহাম্মদীর ইহা কত বড় সৌভাগ্য !

আল্লাহ তাআলা অন্যভাবেও উম্মতে মুহাম্মদীর প্রতি অতি করুণাময়। আল্লাহ তাআলা কলমকে নির্দেশ দিলেন লিখ। নূহের উম্মত অমুক পাপ করিবে আর আমি তাহাদিগকে অমুক শাস্তি দিব। মূসার উম্মত অমুক অমুক নাফরমানী করিবে আর আমি এমনভাবে শাস্তি দিব। লুতের সম্প্রদায় এইরূপ অন্যায় করিবে আমি এইরূপ শাস্তি দিব। এইভাবে সমস্ত পয়গম্বরের উম্মতের পাপের তালিকা করিয়া পাশে শাস্তির তালিকাও কলমকে লিখিয়া রাখার নির্দেশ দিলেন।

তারপর খাতেমুন নাবীঈন সাইয়্যেদুল মুরসালীন (সাঃ)-এর নাম আসিল। আল্লাহ নির্দেশ দিলেন, লিখ, উম্মতে মুহাম্মদী পূর্ববর্তী উম্মতদের কৃত সকল পাপ করিবে। কলম এতটা লিখিবার পর অপেক্ষায় রহিল দেখি আল্লাহ ইহাদের জন্য কি কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করেন।

আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দিলেন– أُمَّةٌ مُذْنِبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ

এই উম্মত পাপী আর আল্লাহ ক্ষমাশীল।

আল্লাহ তাআলা আরও এরশাদ করিয়াছেন– আল্লাহ তাআলা সমস্ত পাপ ক্ষমাকারী।

হুযুর (সাঃ) বিদায় হজ্জ ও দুই তিনবার ওমরা করার পর আরাফাত ময়দানে উপস্থিত হইলেন। সেখানে গিয়া উম্মতের জন্য দোআ করিলেন। আল্লাহ এরশাদ করিলেন–

হে নবীবর ! আপনার পাপী উম্মতদিগকে ক্ষমা করুন এবং তাহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন।

হুযুর (সাঃ) দোআ করিলেন, প্রভু ! তোমার হক তো তুমি ক্ষমা করিয়াছ। কিন্তু বান্দার হকও তো তুমি ক্ষমা করিতে পার। হকদারের যে হক আমার উম্মত নষ্ট করিয়াছে এবং যাহা সে পূর্ণ করিতে পারে নাই, তোমার রহমতের ভাণ্ডার হইতে উহা আদায় করিয়া ঋণীকেও ঋণমুক্ত করিতে পার।

আল্লাহ তাআলা এরশাদ করিলেন, তাহাও আমি ক্ষমা করিয়া দিলাম।

এই উম্মতের প্রতি এত যে মেহেরবানী, ইহা কি কম কথা ?

প্রতি রাতে আল্লাহ তাআলা বলেন, কোন প্রার্থনাকারী আছে কি ? আমি তাহার প্রার্থনা মনযুর করিব। কোন দোআকারী থাকিলে দোআ কর আমি কবুল করিব। কোন ক্ষমা ভিক্ষাকারী থাকিলে ভিক্ষা কর আমি ক্ষমা করিব। আমার মেহেরবানী অসীম। যাহা প্রার্থনা করিবে তাহাই দিব। যদি না চাও তবে আমি চাহিবার জন্য তাকিদ করিব যে, চাও, আমি দিব। আর যদি না চাও তবুও দিব। পর্যাপ্ত পরিমাণে দিব।

পীর ও মুরশিদ বলিলেন, না চাহিতেই যখন তিনি দেন তবে চাহিলে কি না দিবেন ? তিনি বাদশাহ, ইচ্ছা করিলে দোজাহানই এক ফকীরকে দান করিয়া দিতে পারেন।

একদিন হযরত জিবরাঈল (আঃ) হুযুর (সাঃ)-এর নিকট আয়াত– "অতি শীঘ্রই আপনার প্রভু আপনাকে দান করিবেন এবং আপনি সন্তুষ্ট হইবেন" লইয়া আগমন করেন। হুযুর (সাঃ) মহান প্রভুর এই বাণী শ্রবণ করিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া বলিলেন, আল্লাহ তাআলা যতক্ষণ পর্যন্ত আমার পাপী উম্মতদিগকে ক্ষমা না করিবেন ততক্ষণ পর্যন্ত আমি সন্তুষ্ট হইব না।

কোরআন শরীফে মোমেনদের জন্য যত সুসংবাদ দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে কোন প্রকার শর্ত নাই। বরং সাধারণ ওয়াদা। আর সমগ্র কোরআনে যত আযাবের সংবাদ মোমেন পাপীদের জন্য দেওয়া হইয়াছে তাহা সবই আল্লাহর ইচ্ছার সাথে আবদ্ধ। অর্থাৎ আল্লাহ ইচ্ছা করিলে সবই ক্ষমা করিয়া দিতে পারেন। এমন নহে যে, এই আযাব অবশ্যই হইবে। যেমন– আল্লাহ তাআলা বলেন–

"যাহাকে ইচ্ছা আল্লাহ স্বীয় নূর দ্বারা হেদায়াত করেন। ইহা আল্লাহর মেহেরবানী, তিনি বড় মেহেরবান।"

ইহা তাঁহার ইচ্ছাধীন, ইচ্ছা করিলে ক্ষমা করিবেন আবার ইচ্ছা করিলে শাস্তি

islamibookbd.wordpress.com

দিবেন। এই ভয়েই শিরদাঁড়া ভাঙ্গিয়া যায়। কিন্তু যেকোন অবস্থায়ই তাঁহার পবিত্র দরবার হইতে নিরাশ হওয়ার কোন কারণ নাই। আল্লাহ তাআলা বলেন–

لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ

আল্লাহর রহমত হইতে কখনও নিরাশ হইও না।

আমি পাপী ! আমি সীমাহীন পাপী। কিন্তু তিনি নিরাশ না হওয়ার যে বাণী এরশাদ করিয়াছেন, তাহাই আমার একমাত্র ভরসা।

একদিন এক গ্রাম্য আরব দরবারে নববীতে উপস্থিত হইয়া আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা কাহাকে হিসাব লইতে আদেশ দিবেন ?

এই প্রশ্ন শুনিয়া হুযুর (সাঃ) চুপ করিয়া রহিলেন। আল্লাহ তাআলা সংবাদ দিলেন, হে বন্ধু ! আমিই আমার বান্দাগণের হিসাব-কিতাব গ্রহণ করিব। অন্য কাহারও যিম্মায় এই দায়িত্ব দিব না।

হুযুর (সাঃ) মনে মনে ভাবিলেন, আমার উম্মতের হিসাব-কিতাব গ্রহণের দায়িত্ব যদি আমাকে দিতেন তবে তাহাদের পাপের কথা আমি ব্যতীত অন্য কোন লোক জানিতে পারিত না।

এরশাদ হইল, "হে বন্ধু ! আপনার উম্মতের হিসাব আমিই গ্রহণ করিব, যাহাতে আপনিও তাহাদের পাপের বিষয় অবগত হইতে না পারেন।"

প্রেমিক যদি পাপে আবদ্ধ হয় এবং শরাবের প্রতি আসক্ত থাকে, কিন্তু সেই পাপও যদি ক্ষমা পাইতে পারে তবে আর ভয় কিসের ? তদুপরি প্রেমাস্পদ যদি পর্দার অন্তরালে থাকে।

হুযুর (সাঃ)-এর মৃত্যুক্ষণ ঘনাইয়া আসিলে আল্লাহর নিকট আরয করিলেন, প্রভু ! আমার উম্মতদিগকে আমি কাহার আশ্রয়ে রাখিয়া যাইব ?

এমন সময় হযরত জিবরাঈল (আঃ) আগমন করিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলে খোদা (সাঃ) ! আল্লাহ বলেন, আপনার উম্মত আমার দায়িত্বে রাখিয়া আমার নিকট চলিয়া আসুন। তাহা হইলে আপনার পরও আপনার ধর্ম কায়েম থাকিবে। কেয়ামত পর্যন্ত এই ধর্মকে আমি স্থায়ী করিয়া রাখিব। প্রতিদিন ইসলাম বিস্তার লাভ করিবে এবং মুসলমানের সংখ্যা বাড়িতে থাকিবে।

অতঃপর হুযুর (সাঃ) সাহাবাগণকে ডাকিয়া এরশাদ করিলেন, আমার পর আল্লাহ তোমাদের মধ্যে আমার স্থানে থাকিবেন। তাঁহার নিকট তোমাদিগকে সোপর্দ করিয়া গেলাম।

দজ্জাল আবির্ভূত হইয়া সমস্ত দুনিয়া ভ্রমণ করার পর মক্কা ও মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হইবে। এই সময় হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক চতুর্থ আসমান হইতে পৃথিবীতে অবতরণ করিবেন এবং অভিশপ্ত দজ্জালকে হত্যা করিবেন। অতঃপর তিনি চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত হুযুর (সাঃ)-এর প্রতিনিধিত্ব করিবেন। দুনিয়াবাসীকে হুযুর (সাঃ)-এর ধর্মে দীক্ষিত করিবেন। দুনিয়ার কোথাও কাফের, ইহুদী ও খৃষ্টান অবশিষ্ট থাকিবে না। কেহ লুকাইয়া থাকিতে চেষ্টা করিলেও ইট, পাথর এবং গাছ তার স্বরে চিৎকার করিয়া বলিবে ঃ

এই ব্যক্তি ইহুদী, ইহাকে হত্যা কর, এই ব্যক্তি খৃষ্টান, ইহাকে হত্যা কর। এই ব্যক্তি কপট, ইহাকে হত্যা কর।

ইহার পর হযরত ঈসা (আঃ) ইনতেকাল করিবেন। তাঁহার মৃত্যুর পর মুসলমানের সংখ্যা কমিতে কমিতে একেবারে শূন্যের কোঠায় আসিয়া দাঁড়াইবে। বর্ণিত আছে, যতদিন পর্যন্ত দুনিয়ায় একজন লোকও কালেমা বলার মত থাকিবে ততদিন কেয়ামত হইবে না।

যখন একটি লোকও কালেমা তাওহীদ পাঠ করার মত থাকিবে না তখন আল্লাহ তাআলা হযরত ইসরাফীল (আঃ)-কে বলিবেন, এইবার মহাপ্রলয়ের শিঙ্গা বাজাও। হযরত ইসরাফীল (আঃ)-এর প্রথমবার শিঙ্গা বাজানোর সাথে সাথে সমস্ত সৃষ্টি বিলীন হইয়া যাইবে। দ্বিতীয়বার শিঙ্গা বাজানোর পর আবার সব কিছু জীবিত হইয়া উঠিবে।

সোবহানাল্লাহ ! আল্লাহ কত বড় কুদরতের অধিকারী ! একই শিঙ্গা একবার ফুঁকিলে সব কিছু ধ্বংস হইয়া যাইবে। আবার দ্বিতীয়বার ফুঁকিলে সব কিছু পুনর্জীবিত হইবে।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হযরত ! কেয়ামত কি বস্তু এবং কাহাকে বলে ?

এরশাদ করিলেন, প্রথমবার শিঙ্গা ফুঁকার নাম কেয়ামত এবং দ্বিতীয়বার ফুঁকার নাম হাশর। এই দুইবার শিঙ্গা ফুঁকার আওয়ায প্রতিটি প্রাণীর কানে এমনভাবে পৌঁছিবে যেন প্রত্যেকের কানেই একটি করিয়া শিঙ্গা বাজানো হইতেছে। দুইবার

islamibookbd.wordpress.com

শিঙ্গা ফুঁকার মধ্যে চল্লিশ বৎসরের ব্যবধান হইবে। এই চল্লিশ বৎসর সকলেই মৃতাবস্থায় থাকিবে। ফেরেশতাদের মৃত্যু মানুষের মৃতুর ন্যায় হইবে না। তাহাদের মৃত্যু ঘুমের ন্যায় হইবে।

দৈত্য-দানব এবং শয়তানের কেয়ামত ব্যতীত আর মৃত্যু নাই ; বরং প্রতিদিন ইহাদের সংখ্যা বাড়িতেই থাকে। কিন্তু জ্বিনদের জন্ম-মৃত্যু আছে। হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর সময় দানব, দৈত্য এবং শয়তান মাত্রারিক্ত অবাধ্য হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি ভাবিলেন, আমার জীবদ্দশায়ই যখন ইহারা এত অত্যাচারী হইয়া উঠিয়াছে, আমার পর ইহারা মানুষকে শান্তিতে থাকিতে দিবে না। তাই তিনি সকলের হাতে-পায়ে বেড়ি লাগাইয়া দ্বীপে দ্বীপে কয়েদ করিয়া রাখিলেন।

কোন কোন কিতাবে লিখিত আছে, শেষ যমানায় ইহারা মুক্ত হইয়া যাইবে। লোকদের ক্ষতি সাধন করিবে। কাহারও উপর একবার চড়াও হইয়া বসিলে কোন মতেই আর দূর করা যাইবে না। আজকাল দেখা যায়, দেও-দৈত্য কাহারও উপর চড়াও হইলে কোন মতেই দূর করা সম্ভবপর হইয়া উঠে না।

অতঃপর আমি প্রশ্ন করিলাম, পরিণাম ভাল কি মন্দ হইবে ইহা কি করিয়া জানা সম্ভবপর হইবে।

উত্তরে বলিলেন– যেব্যক্তি এই তিনটি কাজ করিবে, তাহার পরিণাম অবশ্যই ভাল হইবে।

প্রথম– কাহারও উপর অত্যাচার না করা। অত্যাচার–উৎপীড়ন খুবই খারাপ কাজ।

দ্বিতীয়– ইসলামের শুকরিয়া আদায় করা।

তৃতীয়– ঈমান চলিয়া যাওয়ার ভয় করা।

اِيْمَانُ الْمَرْءِ بَيْنَ الْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ মানুষের ঈমান আশা ও ভয়ের মধ্যে নিহিত।

এই গুণাবলী কাহারও মধ্যে দেখিলে মনে করিবে, তাহার পরিণাম আল্লাহ চাহে ত অবশ্যই ভাল হইবে। যদি কেহ অত্যাচারী হয়, মুসলামান হওয়ার শুকরিয়া আদায় না করে এবং ঈমান চলিয়া যাওয়ার ভয় না থাকে, তবে মনে করিবে তাহার পরিণতি খুবই ভয়াবহ।

আল্লাহর শুকরিয়া যে, আমাদের এই যুগে আমরা শুনি নাই আমাদের প্রিয় নবীর উম্মতের মধ্যে অমুক ব্যক্তির পরিণতি খারাপ হইয়াছে। পক্ষান্তরে বনী ইসরাঈলের বুযুর্গদের মধ্যে– যেমন– বালআম বাউরা এমন এক বুযুর্গ ছিল, যে আকাশের দিকে মাথা উত্তোলন করিলে আরশ এবং মাথানত করিলে তাহতাস্‌সারা দেখিতে পাইত। তাহার পরিণতি ভয়ানক খারাপ হইয়া গিয়াছিল।

আশেকের দল মায়ের উদর হইতে আরম্ভ করিয়া সারাজীবন কঠিন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে অতিবাহিত করেন। কারণ, তাহারা জানেন না পরিণতি কি হইবে ? যদি ভাল হয় তবে প্রতিশ্রুত সকল কিছুই তাঁহারা পান। আর যদি খারাপ হয় এবং ভাগ্যের লিখিত বস্তু প্রকাশ পায়, তবে তাহাতে ইহকাল পরকাল উভয়ই নষ্ট হইয়া যাইবে। অর্থাৎ কঠোর শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।

islamibookbd.wordpress.com

দ্বাবিংশ মজলিস

শবে বরাত

সাতাইশে রবিউল আউয়াল, শনিবার আমরা দরবারে উপস্থিত ছিলাম। সৈয়দ খালছার পুত্র বলিলেন, 'রওযাতুল ইসলাম' কিতাবে লিখিত আছে, যে মুসলিম রমণী কপালে সিঁদুর লাগায় সে কাফের। বহু মহিলা এই কাজ করিয়া থাকে ; তাহাদের উপায় কি ?

হযরত পীর ও মুরশিদ বলিলেন, কাফেরদের মহিলারা কপালে সিঁদুর লাগায়। এখন দেখিতে হইবে, সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য না ধর্মীয় নীতি পালনার্থ এই সিঁদুর লাগায়। যদি সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য লাগায় তবে কুফরী নহে। আর যদি তাহাদের ধর্মের অঙ্গ হিসাবে লাগায় এবং মুসলমান মহিলারাও লাগায় তবে ইহা কুফরী হইবে। কারণ, কাফেরদের অনুসরণ করাই কুফরী।

হুযুর (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন- مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

যে যে সম্প্রদায়ের অনুসরণ করে সে উক্ত সম্প্রদায়ভুক্ত।

যদি কপালে সিঁদুর লাগানো কুফরী হইত তবে 'কানযুল মাসায়েল' গ্রন্থের গ্রন্থকার অবশ্যই তাহা প্রকাশ করিতেন।

এই সময় আশরাফুদ্দীন রোকন বলিলেন, ইহার পূর্বেও বহু আলেম এই মাসআলা সম্বন্ধে বহু ঘাঁটাঘাঁটি করিয়াছেন। কিন্তু কোথাও কিছু পাওয়া যায় নাই। কপালে সিঁদুর লাগানো যদি কাফেরদের ধর্মীয় অনুশাসন হইত তবে অবশ্যই পাওয়া যাইত এবং আলেমগণও প্রচার করিতেন।

ইহার পর মাখদুম জাহাঁ বলিলেন, কপালে সিঁদুর লাগানো দ্বারা কাফেরদের অনুসরণ করা হয় না। কারণ, আমরা এমন বহু কাজ করিয়া থাকি যাহা কাফেরও করিয়া থাকে। যেমন- কাফের পানাহার করে আমরাও করি, তাহারা কথাবার্তা বলে আমরাও বলি, তাহারা কাপড় পরিধান করে আমরাও করি।

এরূপ আরও অনেক কাজই আমরা করিয়া থাকি, তাহাতে কুফরী হয় না। তাই

সিঁদুর লাগানোও এই জাতীয় কাজ। যাহা তাহাদের ধর্মীয় নীতি তাহাতে যদি আমরা তাহাদের অনুসরণ করি তবে কুফরী হইবে।

এক বন্ধু আরয করিলেন, হিন্দু সম্প্রদায় যে প্রতি বৎসর এক নির্দিষ্ট সময়ে আবীর খেলে অর্থাৎ একে অন্যকে রং ছিটায়, আমাদের মধ্যে যদি কেহ তাহা করে তবে তাহার হুকুম কি হইবে।

এরশাদ করিলেন, ইহা কুফরী। কারণ, তাহারা পরস্পর যে রং ছিটায় ইহা তাহাদের ধর্মীয় কাজ এবং ধর্মের অনুশাসন। আমাদের মধ্যে যে কেহ তাহা করিবে তাহাদের অনুসরণেই করা হইবে। আর যে ধর্মীয় বিষয়ে তাহাদের অনুসরণ করিবে সে কাফের। অধিকন্তু কোন মুসলমান যদি তাহার উপর রং ছিটাইবার অনুমতি দেয় তবে সে কাফের হইবে। হুযুর (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন- اَلرَّاضِىْ بِالْكُفْرِ يَكُوْنُ كَافِرًا

কুফরী কাজে রাযী থাকিলে কাফের হইবে।

এক বন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন, শবে বরাতকে কেন শবে বরাত বলা হয়।

এরশাদ করিলেন,বহু লোক বহু প্রকারে শবে বরাতের অর্থ করিয়াছেন।

কেহ বলেন, এই রাতে আল্লাহ তাআলা পুণ্যশীলদিগকে দোযখ হইতে মুক্তি দান করেন এবং দুর্ভাগা পাপীদিগকে বেহেশত হইতে বঞ্চিত করেন। কারণ, পুণ্যবানদের দোযখের সাথে কোন সম্পর্ক নাই।

এক বুযুর্গ বলেন-

এই রাতে বাদশাহ যখন রাজস্ব আদায় করেন তখন তিনি বরাত দান করেন। এই শবে বরাতে যখন তিনি তাঁহার বান্দাদিগকে দান করেন তখন দুই প্রকার বরাত দান করেন। মোমেনদিগকে আযাব হইতে বরাত দেন এবং যালেম ও কাফেরদিগকে রহমত ও পুণ্য হইতে বঞ্চিত করেন।

আবার কেহ বলেন, এই রাতে লওহে মাহফুয হইতে ফেরেশতাদের কর্ম-তালিকা আনিয়া তাহাদের নিকট দেওয়া হয়। তাহারা সেই তালিকা মোতাবেক আল্লাহর আদেশ-নিষেধ কার্যকর করিয়া থাকেন। আবার শবে বরাতকে ভাগ্য

islamibookbd.wordpress.com

বন্টনের রাতও বলা হয়।

বর্ণিত আছে, এই রাতে হযরত জিবরাঈল (আঃ) হুযুর (সাঃ)-এর নিকট আগমন করিয়া আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক এই রাতের ফযীলত বর্ণনা করেন। তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! এই রাতে আল্লাহ তাআলা তিন হাজার রহমতের দ্বার খুলিয়া দেন। এই রাতে যেব্যক্তি সোবহে সাদেক পর্যন্ত এবাদত-বন্দেগী করে, মেহেরবান আল্লাহ তাহাকে তাঁহার রহমতের জন্য নির্দিষ্ট করিয়া নিরাপদ করিয়া রাখেন।

শবে বরাতের ফযীলতের বিষয় হুযুর (সাঃ) জিবরাঈল (আঃ)-এর নিকট শুনিয়া জান্নাতুল বাকী নামক কবরস্থানে গমন করেন এবং সারারাত জাগ্রত থাকেন। অতঃপর তাঁহার উম্মতদিগকে বলেন, এই রাতে তোমরা জাগ্রত থাকিয়া আল্লাহর এবাদত-বন্দেগী করিবে যেন আল্লাহর রহমত হইতে বঞ্চিত না হও।

মাওলানা মোয়াইয়েদ আরেফ নামক একজন মুরীদ বলিলেন, আমি আজ রাতে খানকা শরীফে কিছু ওয়ায-নসীহত করার অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি। পীর ও মুরশিদ অনুমতি দান করিলে এশার নামাযের পর পীর ও মুরশিদের উপস্থিতিতে তিনি ওয়ায করেন। ওয়ায শেষে অন্যান্য ভক্তদের সাথে জামাআতে দুই দুই রাকআত করিয়া একশত রাকআত নামায আদায় করেন। প্রত্যেক রাকআতে ফাতেহার পর দশবার কুলহু আল্লাহু পাঠ করেন।

ইহার পর তিনি যে কবরস্থানে তাঁহার মা শায়িতা ছিলেন সেখানে গমন করেন এবং মায়ের কবর যিয়ারত করেন। পরে অন্যান্য বন্ধুদের কবর যিয়ারত করার পর বাড়ী ফিরিয়া আসেন।

সকল লোক চলিয়া গেলে আমাকে ডাকিয়া পাঠান। আমি খেদমতে উপস্থিত হইলে তাঁহার মাথার পাগড়ী উঠাইয়া আমার মাথায় পরাইয়া দিলেন। ইহা ছাড়াও অনেক কিছু আমাকে দান করিলেন।

ত্রয়োবিংশ মজলিস

শরীয়ত ও হাকীকত

আঠাশে রবিউল আউয়াল, রবিবার। খানকা শরীফে উপস্থিত মুরীদদের মধ্য হইতে কাযী যাহেদ জিজ্ঞাসা করিলেন, শরীয়ত ও হাকীকত কি ? ইহার অর্থই বা কি ?

এরশাদ করিলেন, হাকীকত এই যে, তাহাতে কোন প্রকার পরিবর্তন পরিবর্ধন জায়েয নাই। হযরত আদম (আঃ) হইতে পৃথিবী ধ্বংস হওয়া পর্যন্ত ইহার ব্যতিক্রম হইবে না। যেমন– আল্লাহর মারেফাতের হাল বা অবস্থা।

শরীয়তে রদবদল জায়েয। শরীয়তের আদেশ-নিষেধ রদবদল হইয়া থাকে। শরীয়তের আভিধানিক অর্থ মুসলমানদের পথ ও মত।

কাযী সাহেব আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, তবকায়ে ওয়াক্ত এবং হাল কাহাকে বলে ?

এরশাদ করিলেন, একই সময়ে অতীত এবং বর্তমান হইতে অজ্ঞাত হইয়া যাওয়া। এই অবস্থা কাহারও মধ্যে সৃষ্টি হইলে তাহাকে ওয়াক্ত বলে। ঐ সময় যদি কেহ অন্য পথে অতিক্রম করে এবং ঐ পথকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করিয়া ওয়াক্তকে স্থায়ী ও আরামদায়ক করে তবে তাহাকে হাল বলা হয়।

কাযী যাহেদ জিজ্ঞাসা করিলেন, তামকীন ও মাকাম কাহাকে বলে ?

এরশাদ করিলেন, লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিয়া যদি আরাম পায় তবে তাহাকে তামকীন বলে। যেমন– নদী ও সাগরের পানি সর্বদিকে চঞ্চলতার সাথে প্রবাহিত হইয়া থাকে। কিন্তু সমুদ্রে পৌঁছার পর সমস্ত চঞ্চলতা হারাইয়া আরামে নিশ্চুপ থাকে। স্রোতধারায় চঞ্চলতা থাকিলেও সমুদ্রে পৌঁছিয়া স্থির হইয়া যায়। নদী একটি স্রোতধারা বুকে করিয়াই শব্দ করে ; আর সমুদ্র হাজার নদী বুকে ধারণ করিয়াও চুপ থাকে।

যখন কাহারও দ্বারা কোন অন্যায় সংঘটিত হইয়া পড়ে, সে যদি কান্নাকাটি করিয়া তওবা করে আর বলে–

islamibookbd.wordpress.com

رَبِّ اِنِّیْ ظَلَمْتُ نَفْسِیْ ظُلْمًا كَثِیْرًا فَاغْفِرْلِیْ ذَنْبِیْ فَاِنَّهٗ لَا یَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ

হে আমার প্রভু ! আমি আমার নফসের প্রতি বহু যুলুম করিয়াছি। আমায় ও আমার পাপকে ক্ষমা কর। কারণ, তুমি ব্যতীত পাপ ক্ষমাকারী আর কেহ নাই। ইহাকে মাকাম বলা হয়। যেমন- হযরত আদম (আঃ) ভুল করার পর তিন শত বৎসর পর্যন্ত তওবা ও কান্নাকাটি করিয়াছিলেন আর বলিয়াছিলেন-

رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْلَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِیْنَ

হে প্রভু ! আমি আমার নফসের উপর যুলুম করিয়াছি। যদি তুমি ক্ষমা না কর, দয়া না কর তবে আমি ধ্বংস হইয়া যাইব।

মোটকথা, মোমেনের কর্তব্য কোন অবস্থায়ই পাপ না করা। জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলিকে মূল্যবান মনে করিয়া সর্বক্ষণ তওবা-এস্তেগফার করিতে থাকিবে। বুযুর্গগণ বলেন,

হে বৃদ্ধ পাপী ! তওবার দ্বার উন্মুক্ত। নানা প্রকার নেয়ামত তোমার জন্য তৈয়ার। তাড়াতাড়ি তওবা কর। কারণ, বিলম্বে তোমার ক্ষতির উপর ক্ষতিই হইবে।

হে ভ্রাত ! এই সুফী সম্প্রদায় প্রতিটি বস্তু এবং প্রতিটি স্থানের জন্য একটি নাম ও একটি পরিভাষা নির্দিষ্ট করিয়া লইয়াছেন, যাহা একমাত্র এই সম্প্রদায়ের লোকই বুঝিতে সক্ষম। যে বুঝার সে বুঝে আর যে না বুঝার সে অবুঝ থাকে।

কাযী যাহেদ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, এমন কেন করা হইল আর এমন কেন হইল না, এই প্রশ্ন করার বান্দার অধিকার আছে কি ?

এরশাদ করিলেন, এই ভাবের কোন কথা বলার অধিকারই বান্দার নাই।

আল্লাহ ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন, তাঁহার কাজ সম্বন্ধে প্রশ্ন করার কাহারও কোন অধিকার নাই। কাহার ক্ষমতা আছে যে তাঁহার কারখানার দিকে ফিরিয়া তাকায়, তাঁহার কাজ সম্বন্ধে মুখ খোলে।

یَفْعَلُ اللّٰهُ مَا یَشَآءُ وَیَحْكُمُ مَا یُرِیْدُ

আল্লাহ যাহা ইচ্ছা করেন এবং যাহা ইচ্ছা আদেশ করেন।

কবি ঠিকই বলিয়াছেন- (ভাবার্থ)

কাহার এত বড় সাহস যে, তোমার প্রতাপের সামনে মাথানত করা ব্যতীত মুখ খোলার সাহস পায়।

ইহা অমুখাপেক্ষীর দরবার। কাহারও কিছু জিজ্ঞাসা করার হক নাই। যাহাকে গ্রহণ করার বিনা কারণেই করিয়াছেন এবং যাহাকে প্রত্যাখ্যান করার বিনা কারণেই প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। যাহা ইচ্ছা করেন কথার ইহাই রহস্য।

কোন কবি বলিয়াছেন- (ভাবার্থ)

অনাদিকালে কি নির্ধারণ করা হইয়াছে আমি কিছুই জানি না। কাহার পরিণতি গ্রহণযোগ্য তাহাও জানি না। তোমার কার্যাবলী কেহই অবগত নহে। তোমার অমুখাপেক্ষিতাকে ভয় না পায় এমন কে আছে ?

এক বন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন, যাহা সহ্য করার বা মোকাবিলা করার ক্ষমতা নাই তাহা হইতে পশ্চাদপসরণ কি পয়গম্বরদের সুন্নত।

এরশাদ করিলেন, হাঁ ! হুযুর (সাঃ)-এর পক্ষে যখন মক্কায় বসবাস করা অসম্ভব হইয়া উঠিল তখন তিনি হযরত আবু বকরকে সাথে লইয়া মদীনার পথে হিজরত করিলেন। তিনি চলিয়া যাওয়ার সাথে সাথেই তাঁহার শত্রুগণ পিছনে ধাওয়া করিল। হুযুর (সাঃ) ও হযরত আবু বকর পর্বত গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। গুহা মুখে মাকড়সা জাল বুনিয়া রাখিল। শত্রুরা গুহা মুখে মাকড়সার জাল দেখিয়া মনে করিল- ইহার মধ্যে কোন লোক যাইতে পারে না। তাহারা বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া গেল।

হুযুর (সাঃ) ও হযরত আবু বকর (রাঃ) গুহা হইতে বাহির হইয়া মদীনার পথে রওয়ানা হইলেন এবং নিরাপদে মদীনায় উপস্থিত হইলেন। এই কাহিনী বলার উদ্দেশ্য এই যে, কোন কিছুর মোকাবিলা করায় অসমর্থ হইয়া পশ্চাদপসরণ করা

islamibookbd.wordpress.com

যে সুন্নত, ইহাই তাহার প্রমাণ।

তারপর আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, বালা-মসিবত দেখিয়া পলায়ন করাও কি সুন্নত ?

এরশাদ করিলেন, হাঁ! ইহাও পয়গম্বরদের সুন্নত। হযরত মূসা (আঃ)-এর প্রতি নির্দেশ আসিল–

আল্লাহ বলিলেন, হে মূসা ! লাঠি মাটিতে ফেলিয়া দাও। লাঠি ফেলিয়া দিতেই উহা ধাবমান সাপে পরিণত হইল।

লাঠি সাপ হইয়াই হযরত মূসা (আঃ)-কে আক্রমণ করিত উদ্যত হইল। তিনি ভয়ে দৌড় দিলেন।

আল্লাহ পাক এরশাদ করিলেন, উহা ধর এবং ভয় করিও না। উহা আসল আকৃতিতে ফিরিয়া আসিবে। হযরত মূসা (আঃ) ধরিতেই উহা পূর্ববর্তী রূপ লাঠিতে রূপান্তরিত হইল।

সুতরাং দেখা গেল, বিপদ দেখিয়া মূসা (আঃ) ভাগিয়াছিলেন। অন্যান্য পয়গম্বরের জীবনেও এমন নিদর্শন রহিয়াছে। সুতরাং ইহাও পয়গম্বরদের সুন্নত। কেহ যদি ধৈর্যধারণ না করে, আল্লাহর সিদ্ধান্তে রাযী না থাকে, তাহার সম্বন্ধে নিম্নরূপ ধমক আসিয়াছে–

"নিশ্চয় আমিই আল্লাহ। আমি ব্যতীত কোন আল্লাহ নাই। আমার কাজে যে সন্তুষ্ট নহে ; আমার দেওয়া বিপদে যে ধৈর্যধারণ না করে এবং যে আমার নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় না করে, সে যেন আমার রাজ্য হইতে চলিয়া যায় এবং আমা ব্যতীত অন্যকে প্রভু হিসাবে গ্রহণ করে।" তারপর বলিলেন, বিপদ দেখিয়া পলায়ন করার আদেশ আছে এবং ইহা ধৈর্যের প্রতিবন্ধক নহে। বিপদে ধৈর্যধারণ কাহাকে বলে জান ? বিপদ আসিলে অসন্তুষ্ট না হওয়াই ধৈর্যধারণ। খোদা প্রেমিকদের যত বিপদই আসে তাঁহারা সাদরে গ্রহণ করেন এবং হাসিমুখে বিপদের তিক্ততা বরণ করিয়া লন ; বরং আরও বিপদ আসার অপেক্ষায় থাকেন এবং বলেন–

"একটিই তো মাত্র প্রাণ আমার, যে তোমার প্রেমের বোঝা বহন করিবে। যতক্ষণ তোমার কাজ না আসে পশ্চাদপসরণের নাম নাই। তোমার প্রেমে যে বিপদ জীবনের উপর আসে তখন তো এই আশা যে, একের পরিবর্তে যেন হাজার বিপদ আসে।"

চতুর্বিংশ মজলিস

মিলন সেতু

উনিত্রিশে রবিউল আউয়াল, সোমবার। দরবারে উপস্থিত মুরীদদের মধ্য হইতে কাযী যাহেদ বলিলেন, হুযুর (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন–

"যেব্যক্তি আমাকে সফর মাস গত হওয়ার সুসংবাদ দিবে আমি তাহাকে বেহেশতের সুসংবাদ দিব।" পয়গম্বরদের নিকট মাসের কোন প্রকার ভাল-মন্দ বা কোন বস্তুর কোন প্রকার কঠোরতা নাই। বরং সকল মাসই তাঁহাদের নিকট সমান। সুতরাং হুযুর (সাঃ) কোন্ উদ্দেশে এমন কথা বলিলেন ?

পীর ও মুরশিদ এরশাদ করিলেন, এই হাদীসের অনেক প্রকার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। প্রথমত সফর মাসে হুযুর (সাঃ) অসুস্থ হন। আল্লাহ তাআলা তাঁহাকে কথা দিয়াছিলেন, হে বন্ধু ! সফর মাস অতিবাহিত হওয়ার পরই আপনি আমার সাথে মিলিত হইবেন। তাই সফর মাস হুযুর (সাঃ)-এর জন্য কষ্টকর কোন কিছু ছিল না। বরং সফর মাস অতিবাহিত হইতে যে বিলম্ব হইতেছিল এবং যে বিলম্বের ফলে বন্ধুর সহিত মিলিত হওয়ার অপেক্ষায় ছিলেন, তাহাই তাঁহার জন্য কষ্টকর ছিল। তিনি অপেক্ষা করিতেছিলেন, কখন সফর মাস শেষ হইবে আর আমি আমার আরাধ্য জনের সহিত গিয়া মিলিত হইব।

ইহার পরিপ্রেক্ষিতেই তিনি এরশাদ করিয়াছেন, যে আমাকে সফর মাস শেষ হওয়ার সংবাদ দিবে আমি তাহাকে বেহেশতের সুসংবাদ দিব।

ইমাম যাহেদ (রঃ) তাফসীরে লিখিয়াছেন, বারই রবিউল আউয়াল সোমবার হুযুর (সাঃ) এই নশ্বর দুনিয়া ত্যাগ করিয়া পরম বন্ধুর সাথে গিয়া মিলিত হন। ইহার রহস্য হইল–

মৃত্যু বন্ধুর সাথে বন্ধুর মিলন সেতু।

এখানে তিনি বলিয়াছেন, হুযুর (সাঃ)-এর জীবদ্দশায় সাহাবাগণ যে সমস্ত কাজ-কারবার করিতেন তাঁহার ইনতেকালের পর আর সেই সবে তেমন বরকত ও সুযোগ-সুবিধা পাইতেছিলেন না। তাঁহারা ভয় পাইলেন, নিশ্চয়ই আমাদের ধর্মীয়

islamibookbd.wordpress.com

কাজে শিথিলতা আসিয়াছে। এই ধারণা হইতে তাঁহারা ঘর-বাড়ী, স্ত্রী-পুত্রের মায়া পরিত্যাগ করত ধর্মীয় কাজের জন্য নির্জনতা অবলম্বন করিলেন।

"পাহাড় জঙ্গলের ঐ সমস্ত জীব-জন্তুর ন্যায় জীবিকানির্বাহ কর যাহারা সব কিছু দেখিয়া ভয় পায় এবং বাড়ী-ঘর ইঁদুর-বিড়ালের জন্য ছাড়িয়া দাও।

ধর্মের চিন্তা যাহার অন্তরে স্থায়ী হইয়া যায়, ঘর-বাড়ী, সন্তান-সন্ততি তাহার চলার পথে বাধা সৃষ্টি করিতে পারে না।

উপস্থিত ভক্তদের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করিলেন, হযরত হাসান বসরী (রঃ) সাহাবী ছিলেন কিনা?

তিনি বলিলেন, সাহাবী নহেন, কিন্তু সাহাবীদের তিনি দেখিয়াছেন। তিনি ছিলেন তাবেয়ী। তিনি যত সাহাবী দেখিয়াছেন অন্য কোন তাবেয়ীর সেই ভাগ্য হয় নাই।

তারপর বলিলেন, একদিন তিনি বহু লোকের সাথে বসা ছিলেন। তাহাদেব মধ্য হইতে একজন জিজ্ঞাসা করিলেন, হযরত! সাহাবীদের দৃষ্টিতে আমরা কেমন? তিনি উত্তর করিলেন, তোমাদিগকে তাঁহারা দেখিলে বলিতেন তোমরা শয়তান সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। আর যদি তোমরা তাঁহাদিগকে দেখিতে এবং তাঁহাদের আচার-ব্যবহার প্রত্যক্ষ করিতে তবে বলিতে, ইহারা তো উন্মাদ! বোধ শক্তি বিবর্জিত পাগল।

হযরত হাসান বসরীর বর্ণনামতে এই ছিল তাবে তাবেয়ীদের অবস্থা। অথচ হিজরতের পর তখনও একশত চল্লিশ বৎসর অতিবাহিত হয় নাই। আজ আমরা শত শত বৎসর পরের লোক। অথচ আমরা আমাদিগকে মুসলমান বলিয়া পরিচয় দান করি।

প্রতিমার উদ্দেশে সেজদা করিয়া কপালে দাগ পড়িয়া গিয়াছে। এই অবস্থায় মুসলমান বলিয়া পরিচয় দিয়া নিজেকে আর কতকাল দোষারোপ করিব?

যাহারা পরবর্তীকালে জন্মগ্রহণ করিবে তাহাদের জন্য পরিতাপ। আল্লাহ জানেন তাহাদের কি অবস্থা হইবে?

এক বন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন, ধৈর্যধারণ করা কি ঈমানের শর্ত? এরশাদ করিলেন, হাঁ, ধৈর্যধারণ করা ঈমানের শর্তাবলীর মধ্যে একটি শর্ত।

—তাহা হইলে যেব্যক্তি ধৈর্যশীল নহে তাহার অবস্থা কি হইবে।

বলিলেন, এমন কথাই হইতে পারে না। প্রতিটি লোক তাহার ঈমান অনুযায়ী ধৈর্যশীল। কাহারও ধৈর্য প্রকাশ পায় আবার কাহারও ধৈর্য গোপন থাকে। শোন! হুযুর (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন– اَلْاِيْمَانُ صِنْفَيْنِ ঈমানের দুইটি অংশ। একাংশ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন এবং অন্যাংশ ধৈর্যাবলম্বন। ইহাতে প্রমাণিত হয়, যেব্যক্তি لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ বলে সে-ই ধৈর্যশীল। কোন মোমেনই ধৈর্যহীন নহে এবং হইবেও না। ধৈর্যধারণের ক্ষমতা আল্লাহই দান করেন। বান্দার কর্তব্য সর্বদা আল্লাহর নিকট ধৈর্যধারণের ক্ষমতা প্রার্থনা করা। যেমন– আল্লাহ তাআলা বলেন–

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ۝

হে মোমেনগণ! নামায ও ধৈর্যধারণের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য কামনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথী।

সমস্ত লোকই দুইটি অবস্থার সাথে জড়িত। হয় সে সুখে-সম্পদে থাকে অথবা বিপদে জড়িত হয়। যদি সুখে-সম্পদে থাকে তবে আল্লাহ তাহার নিকট কৃতজ্ঞতা চাহেন। আর যদি বিপদে জড়িত হয় তখন তাহার নিকট ধৈর্যধারণের প্রত্যাশা করেন। যেব্যক্তি এই দুই প্রকার গুণে গুণান্বিত নহে, তাহার পক্ষে ঈমানের দাবী করা বাতুলতা ব্যতীত আর কিছুই নহে। ওয়াস সালাম।

islamibookbd.wordpress.com

পঞ্চবিংশ মজলিস

চরিত্রের পরিবর্তন

পহেলা রবিউস সানী, বুধবার। পবিত্র দরবার শরীফে সেই দিন চরিত্র পরিবর্তন সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা হইতেছিল।

পীর ও মুরশিদ এরশাদ করেন, সূফীগণ গুণের পরিবর্তনকে বিবর্তন বলিয়া থাকেন। মুরীদের প্রথম কর্তব্য হইল খারাপ স্বভাবকে সৎস্বভাবে, ক্রোধকে সহনশীলতায়, কৃপণতাকে বদান্যতায় ও অহংকারকে বিনয়ে পরিণত করা, রূঢ় কথার পরিবর্তে মিষ্টি ভাষা প্রয়োগ করা, অন্যায় কিছু না করিয়া ন্যায়নিষ্ঠ হওয়া ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি মনোনিবেশ করা।

এই সমস্ত কাজ মুরীদের পক্ষে ওযু করার ন্যায়। যেমন ওযু ব্যতীত নামায হয় না। তেমনি ঐ সমস্ত বিষয়বস্তু আয়ত্তে আনিতে না পারিলে তাহার পক্ষে তরীকতের পথে চলা সম্ভবপর হয় না। সাধন-ভজনের মূলই হইল ঐ সমস্ত বিষয়ের অধিকারী হওয়া।

সূফী সম্প্রদায় বলেন, এই সমস্ত গুণ আয়ত্তাধীন হইলে পূর্ণ পবিত্রতা অর্জিত হয়। ইহার পর যেকোন এবাদত-বন্দেগীই করা হয় তাহা সার্বিক হয় এবং আল্লাহ কবুল করেন। পরকালে তাহা ফলপ্রসূ হইবে।

যেই দুর্ভাগা এই গুণাবলীর সামান্যতম কিছুও অর্জন করিতে না পারে সে যত নামায পড়ুক, রোযা রাখুক আর স্বার্থান্বেষী আলেমগণ ঐ সমস্ত এবাদত-বন্দেগী দুরস্ত হওয়ার যত ফতওয়াই দিক না কেন, এই দুর্ভাগা যেইসব কর্তব্য কাজ সমাধা করিয়াছে, পরকালে সেইসব তাহার কোন কাজেই আসিবে না।

তাই সূফী সম্প্রদায় এই বিবর্তনকে ফরযে আইন বলিয়া থাকেন। এই সমস্ত গুণ অর্জিত হইলে নফস পরাভূত হইয়া যায়। আর যে নফস পরাভূত হয় না, অন্তর সেই কাফের নফসের কয়েদী। নফস যে আদেশ দেয় অন্তর কয়েদীর ন্যায় সেই আদেশই পালন করে।

এইভাবে বুঝিয়া লও যে, মুসলমানী কাফেরীর হাতে বন্দী। তাই কাফের নফস যাহা বলে, মুসলমান (অন্তর) তাহার আদেশ পালনে হাঁ না বলিয়া তবে কি করিবে?

অন্তর এবং নফসের ইহাই পরিচয়। অন্তর কখনও এমন কথা বলে না যে, দোযখের দিকে যাইতে হইবে। অন্তরের সিংহাসনে নফস উপবিষ্ট হইয়া বলে, اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى আমিই তোমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রভু।

আর অন্তরের পরিচয় হইল, মোমেনের কলব আল্লাহর আরশস্বরূপ। মোমেনের অন্তকরণ আল্লাহর ঘর। মোমেনের অন্তকরণ তাহাতেই শান্তি পায়।

কাফের নফস আমাদের অন্তরে বাসা বাঁধিয়াছে এবং অন্তরকে তাহার বন্দী দাসে পরিণত করিয়াছে।

অন্তরে দেবদেবী প্রকাশ্যে মোনাজাত। হে অন্তকরণ! এখন মুসলমান হও, পৈতা ছিঁড়িয়া ফেল। কাফেরী তোমার অন্তরে বাসা বাঁধিয়াছে। এই কারণেই আজ পৃথিবীতে মুসলমানের সংখ্যা কম।

স্বভাব পরিবর্তনে নফস যখন বাহির হইয়া যায় তখনই অন্তর বাদশাহ হইয়া নফসকে বন্দী করে। অন্তর বাদশাহ হওয়ার সাথে সাথেই ঈমানের সূর্যোদয় হয় এবং ইসলাম স্বীয় সৌন্দর্য প্রদর্শন করে। মারেফাতের দ্বার তাহার বক্ষস্থল উন্মুক্ত করিয়া দেয়। তারপর হযরত পীর ও মুরশিদ বলিলেন–

অসদগুণাবলী যখন পরিবর্তন হইয়া যায় তখন তোমার সমস্ত সমস্যারও সমাধান হইয়া যায়। তোমার অস্তিত্ব যখন বিলীন হইয়া ফানার অবস্থা প্রকাশ পায় তখন তোমার মধ্য হইতে আনাল হক (আমি সত্য) শব্দ উত্থিত হইতে পারে।

ইহার অর্থ এই যে, তোমার পক্ষে যতটা সম্ভব তুমি যেন নফসের নির্দেশমত না চল, অন্যথায় ধ্বংস হইয়া যাইবে। সমস্ত বুযুর্গই নফসের এই অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞাত। তাঁহারা নফসের ধোঁকা হইতে কান্নার সাথে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিয়া বলেন–

আহ! আমার মা যদি আমাকে প্রসবই না করিতেন তবে কাফের নফস আমাকে ধ্বংস করিতে পারিত না। আমার জন্মের পর জীবিত দেখিয়া যদি আমার নামই না রাখিত, তবে পার্থিব কাজকর্ম এবং আরাম-আয়েশের জন্য আমাকে প্রশ্নই করা হইত না।

একদিন কোন বুযুর্গের ইচ্ছা হইল তিনি মুরগীর ডিম খাইবেন। তিনি নফসকে

islamibookbd.wordpress.com

উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, আমি যতদিন জীবিত আছি মুরগীর ডিম খাইব না। এই ওয়াদা স্মরণ রাখিয়াই তিনি বিদেশ ভ্রমণে বাহির হইলেন।

এক যুগ অর্থাৎ বার বৎসর পর্যন্ত তিনি সফরে থাকেন। একদিন তিনি কোন এক শহরে উপস্থিত হইলেন। তথাকার এক বুযুর্গ আসিয়া বলিলেন, ওহে শায়খ ! আজ আপনি আমার গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করুন। বুযুর্গ দাওয়াত কবুল করিলেন এবং মেজবানের সাথে তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইলেন।

এই সময় মেজবানের গৃহে মুরগীর ডিম এবং রুটি ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। তিনি তাহা আনিয়া মেহমানের সম্মুখে রাখিলেন। মেহমান খাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইলেন। এমন সময় তাঁহার নফস বলিয়া উঠিল, পরিশেষে এক যুগ পর আমার ইচ্ছা পূরণ করিতে যাইতেছি। বুযুর্গ উপলব্ধি করিতে পারিলেন, নফসের আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হইতে যাইতেছে। তিনি বলিলেন, খোদার কসম ! এখনও তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই।

এই কথা বলিয়াই তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং আহার না করিয়াই চলিয়া গেলেন।

বুযুর্গগণ নফসকে এইভাবেই পরাস্ত করিতেন এবং এইভাবেই তাঁহাদের উদ্দেশ্য সাধন হইত। আর তোমাদের ধারণা, পিতা-মাতার অনুসরণ করত শুধু রোযা-নামায দ্বারাই বৈতরণী পার হইয়া যাইবে। কখনও নহে। এইভাবে লক্ষ্যস্থল পৌছা সম্ভবপর হইবে না।

ইহার পূর্বের যত কিছু আশা-আকাঙ্ক্ষা আছে তাহা তো স্বভাবসিদ্ধ। তাহাকে ধর্ম বলা যাইতে পারে না।

ষষ্ঠ বিংশ মজলিস

হুযুর (সাঃ)-এর বাণী

দোসরা রবিউস সানী, বৃহস্পতিবার। কাযী যাহেদ জিজ্ঞাসা করিলেন, হুযুর (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, শরীয়ত আমার বাণী, তরীকত আমার কার্যাবলী এবং হাকীকত আমার অবস্থা। শরীয়ত, তরীকত এবং হাকীকত একই বস্তু না ভিন্ন ভিন্ন বস্তু।

পীর ও মুরশিদ বলিলেন– সকলের মূলেই হইল শরীয়ত। শরীয়তে পাকাপোক্ত না হওয়া পর্যন্ত তরীকত ও হাকীকত অর্জিত হয় না।

শরীয়তের পথে তরীকতে প্রবেশ কর, যেন অবস্থার মনযিল স্বীয় নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অর্জিত হয়।

শরীয়ত ও হাকীকত বিচ্ছিন্ন বিষয় নহে। لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ হাকীকত, مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ শরীয়ত। যদি কেহ শুধু لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ বলে এবং মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ না বলে, তবে সে মুসলমান হইবে না। ইহাতে মনে হয় শরীয়ত, তরীকত ও হাকীকত একই বস্তু এবং শরীয়ত হইতে পৃথক নহে। ইহার তারতম্যও বলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

হুযুর (সাঃ) বলিয়াছেন, শরীয়ত আমার নির্দেশ। অর্থাৎ যাহা কিছু আমার নির্দেশ তাহা সহজতর এবাদত, জনসাধারণ সহজে আদায় করিতে সক্ষম হয়। তরীকত আমার কার্যাবলী, যাহা কষ্টকর এবং নিজেকে সাধনার অগ্নিতে নিক্ষেপ করা হয়। ওযু করা শরীয়ত, কিন্তু দিন-রাত ওযু সহকারে থাকা তরীকত। এই শক্তি জনসাধারণের মধ্যে কোথায় ? কিন্তু হুযুর (সাঃ) যাহাকে তরীকত বলিয়াছেন তাহা জনসাধারণকে করার নির্দেশও দেন নাই ; আবার করিতে নিষেধও করেন নাই।

হুযুর (সাঃ)-এর অন্তর মোবারক আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত। এই রহস্য সম্বন্ধে কেহই কিছু অবগত নহে।

islamibookbd.wordpress.com

এক বন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি একবার এরশাদ করিয়াছেন যে, অনুকরণীয় ঈমান এবং আমাদের ঈমান একই সমতুল্য। কোথায় আরেফদের ঈমান আর কোথায় অনুকরণকারীদের ঈমান ''ইহা বুঝিতে পারিলাম না।

এরশাদ করিলেন, ইহার অর্থ হইল, অনুকরণকারীর ঈমান কাফেরের কুফরীর দিক হইতে ঈমান এবং বেহেশতে প্রবেশ করা তাহার পরিণতি। কিন্তু তাহাতে সন্তুষ্ট থাকা সামান্য পর্যায়ের সন্তুষ্টি। এই সম্প্রদায়ের মতে, তাহাদের এই সামান্য পর্যায়ের সন্তুষ্টি হারাম। তালেবের কোন কিছু অর্জিত হইলে তাহাতে স্থির-স্থিত থাকা ঠিক নহে। আল্লাহ ব্যতীত অন্য সব কিছুকে তাঁহারা প্রতিমা এবং পৈতা মনে করেন। উচ্চ ধারণা ও শক্তি রাখিয়া আসল উদ্দেশ্য সাধনে লিপ্ত থাকিবে।

আরেফের ঈমানও ঈমানই। আরেফ আসল উদ্দেশ্যস্থলে না পৌঁছার দরুন নিজের ঈমানকে অনুকরণকারীর ঈমানের ন্যায়ই মনে করেন। মোশাহাদা না পাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে উভয়েই সমান। যেমন– এক দেরহামের সম্মুখে দশ দেরহাম অনেক বেশী। দশ হাজার দেরহাম একহাজার দেরহামের চেয়ে অনেক বেশী। কিন্তু অপরিমিতের সামনে কোথায় দশ আর কোথায় হাজার দেরহাম ; বরং উভয়ই সমান। রাস্তা খুবই কঠিন। পথপ্রদর্শক ব্যতীত এই পথে চলা দুঃসাধ্য।

হাঁ, দেখ ! এই পথে চিন্তা-ভাবনার সাথে পা রাখিও। কারণ, এই পথ বাধা-বিঘ্নে পরিপূর্ণ।

তারপর বলিলেন– সিদ্দীকে আকবর বলেন– ঈমান কি ?

সুতরাং অন্যে আর কি বলিবে ? কিভাবে এরূপ ঈমানের প্রতি ভরসা করা যায়।

এতটা হিম্মত থাকিতে হইবে যেন ঈমানের পথের বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করা যায় এবং আশান্বিত থাকিবে যেন উদ্দেশ্যস্থলে পৌঁছা যায়।

তারপর বলিলেন, যে প্রেমের দাবী করে তাহার পক্ষে উচিত দুইটি বিপদের জন্য তৈয়ার থাকা। প্রথম– আল্লাহ তাআলার পক্ষ হইতে যে বিপদাপদ অবতীর্ণ হয় তাহার জন্য তৈয়ার থাকা। দ্বিতীয়– সৃষ্টির তরফ হইতে যে বালা-মসিবত আসিতে পারে তাহার জন্যও সদা তৈয়ার থাকা। তাই এই সম্প্রদায় কখনও ভালবাসার দাবী করেন না। কারণ, তাঁহারা উভয় প্রকার বিপদের নমুনাই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তাঁহারা জানেন, প্রেমের দাবী করিলে অবশ্যই প্রমাণ চাওয়া হইবে। এতদসত্ত্বেও তাঁহারা প্রেমের কারবার করেন না। আশা রাখেন লক্ষ্যস্থলে পৌঁছার।

মানুষের কর্তব্য, যতদিন জীবিত থাকে ততদিন চেষ্টা হইতে ক্ষান্ত না থাকা।

বাদশাহ হওয়ার দাবী করিও না। প্রভুর দাস হইয়া সাক্ষাত লাভের অপেক্ষা কর। প্রেমের ধর্ম হইল, বিপদ যতই হউক ধৈর্যধারণ করা।

হযরত নূহ (আঃ) সাড়ে নয়শত বৎসর জীবিত ছিলেন। তিনি যখনই লোকদিগকে আল্লাহর পথে আহ্বান করিতেন তখনই তাহারা তাঁহাকে ইট-পাথর নিক্ষেপ করিত। একদিন তাঁহার সম্প্রদায় তাঁহাকে সত্তর বার ইট-পাথর নিক্ষেপ করে। তিনি প্রতিবারই অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া যান।

যখন জ্ঞান ফিরিয়া আসিত তখন আবার সকলকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান করিতেন। নবী ব্যতীত এমন সহ্য শক্তি আর কাহারও থাকিতে পারে না। এক বন্ধু বলিয়াছেন–

জানি না, এই পথের বীরগণ কোন্ উচ্চ মর্যাদায় আসীন ছিলেন। কারণ, তাঁহারা আমল দ্বারা কখনও তৃপ্তি লাভ করেন নাই। পরিশেষে সত্যের গোলামী করার পর্যায়ে আসিয়াছেন এবং শাহানশাহে পরিণত হইয়াছেন। সমস্ত সৃষ্টির নেতায় পরিণত হইয়াছেন। সত্য বলিতে কি, তাঁহাদের ব্যথা নিজেদের সৃষ্টি নহে ; বরং খোদার দান। এমন ব্যথা কষ্টে অর্জিত হইতে পারে না।

সহ্য করার ক্ষমতা অনুযায়ী বিপদ সকলের উপরই অবতীর্ণ হয়। যেমন– হযরত মূসা (আঃ)-কে মায়ের নিকট হইতে সকালে পৃথক করিয়া আবার সন্ধ্যায় মায়ের মানিক মায়ের কোলে পৌঁছাইয়া দিয়াছেন। পক্ষান্তরে হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া চল্লিশ বৎসর পর পিতার হৃদয়ের ধন পিতার নিকট পৌঁছাইয়া দিয়াছিলেন।

ইহার রহস্য এই যে, হযরত মূসা (আঃ)-এর মা দুর্বলচেতা রমণী ছিলেন। পুত্রের বিচ্ছেদ যাতনা সহ্য করার মত ক্ষমতা তাঁহার খুবই কম ছিল। তাই তাঁহার পুত্রকে সকালে বিচ্ছিন্ন করিয়া আবার সন্ধ্যায় ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। হযরত ইয়াকুব (আঃ) পুরুষ ছিলেন। তাঁহার ধৈর্যধারণ ক্ষমতাও অধিক ছিল। তাই চল্লিশ বৎসরের ব্যবধানে পিতা-পুত্রের মিলন হইয়াছিল। কঠিন বিপদ নবীর উপর অবতীর্ণ হয়। তারপর তাঁহাদের সাথে যাঁহাদের সাদৃশ্য থাকে তারপর নবীর সাথে সাদৃশ্যশীলদের সাথে যাঁহাদের সাদৃশ্য থাকে। এইরূপ পর্যায়ক্রমে বিপদ অবতীর্ণ হইয়া থাকে। হযরত আইউব (আঃ)-এর দেহে যখন পোকায় আক্রমণ করিল তখন দেহের গোশত শেষ করিয়া হাড় পর্যন্ত চলিয়া গেল। এই অবস্থায়ও তিনি আল্লাহর নিকট কোন প্রকার ফরিয়াদ করেন নাই। বরং আল্লাহ যাহা করিতেছিলেন তাহাতেই তিনি সন্তুষ্ট থাকিয়া আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করিতেছিলেন।

islamibookbd.wordpress.com

দেহে গোশত না থাকায় কীটের দল তাঁহার জিহ্বা ও অন্তরের দিকে ধাবিত হইল। তখন তিনি ক্রন্দন করিয়া আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করিলেন। কিন্তু বিপদে অধীর হইয়া তিনি ফরিদ করেন নাই ; বরং তাঁহার জিহ্বা ও অন্তর নষ্ট হইয়া যাইবে এই ভয়ে তিনি ফরিয়াদ করিয়াছিলেন। অর্থাৎ তিনি আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করিলেন, হে খোদা ! আমার অন্তর ও জিহ্বা যদি কীটের খাদ্যে পরিণত হয় তবে তোমার নাম আমি কি উপায়ে স্মরণ করিব ? এই অবস্থায় তিনি মোনাজাত করিলেন–

إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

হযরত আইউব (আঃ) যখন তাঁহার প্রভুর নিকট ফরিয়াদ করিলেন, হে প্রভু ! আমি বিপদাপন্ন। আমার প্রতি দয়া প্রদর্শন কর। তুমি অত্যন্ত মেহেরবান।

তারপর হযরত মূসা ও হযরত খিযির (আঃ) প্রসঙ্গে বলিলেন, একদিন হযরত মূসা (আঃ) মিম্বরে দাঁড়াইয়া ওয়ায করিতেছিলেন। এমন সময় সেখানে এক পাগল আসিয়া উপস্থিত হইল এবং প্রশ্ন করিল, مَنْ أَعْلَمُ النَّاسِ শ্রেষ্ঠ আলেম কে ?

হযরত মূসা (আঃ) বলিলেন, আমিই শ্রেষ্ঠ আলেম। অতঃপর তিনি পাহাড়ে গমন করিয়া আল্লাহর নিকট জানিতে চাহিলেন, হে আল্লাহ ! সত্যই কি তুমি আমাকে সকলের চেয়ে বেশী জ্ঞান দান করিয়াছ ?

আল্লাহ তাআলা এরশাদ করিলেন, খিযির নামে আমার এক বান্দা আছে, সে তোমার চেয়ে বড় আলেম।

হযরত মূসা (আঃ) আরয করিলেন, হে প্রভু ! আমাকে তুমি তাঁহার সাথে সাক্ষাত করাইয়া দাও যেন আমি তাঁহার নিকট হইতে জ্ঞানার্জন করিতে পারি। আল্লাহ প্রার্থনা কবুল করিলেন এবং তাঁহার নিকট হইতে জ্ঞানার্জন করার সুযোগ দান করিলেন। তিনি বহু সন্ধানের পর হযরত খিযির (আঃ)-এর সাক্ষাত পাইলেন। পবিত্র কোরআন এই সম্বন্ধে বলে–

"আমার বান্দাদের মধ্যে আমার খাস রহমত প্রাপ্ত এক বান্দার সাক্ষাত সে পাইল এবং তাহাকে আমি এক বিশেষ প্রকারের এলম দান করিয়াছি।"

সন্ধান করার পর যখন তিনি বাঞ্ছিত জনের সাক্ষাত পাইলেন তখন হযরত খিযির (আঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহর নবী ! কি প্রয়োজনে আপনি এই কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন ?

হযরত মূসা (আঃ) বলিলেন, আপনার নিকট হইতে শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য। খিযির (আঃ) বলিলেন, আপনি কি আমার কার্যকলাপ সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করিতে পারিবেন ? এই প্রসঙ্গে আল্লাহ পাক বলেন–

খিযির বলিল, নিশ্চয়ই আপনি আমার সাথে থাকিয়া ধৈর্যধারণ করিতে পারিবেন না।

মূসা বলিলেন, আমি ধৈর্যধারণ করিব।

উভয়ে সেখান হইতে রওয়ানা হইয়া এক নদীর তীরে উপস্থিত হইলেন এবং নদী অতিক্রম করার জন্য নৌকায় আরোহণ করিলেন। নৌকা যথাস্থানে পৌঁছার কিছু পূর্বেই খিযির (আঃ) নৌকাখানি ছিদ্র করিয়া ফেলিলেন।

হযরত মূসা (আঃ) বলিলেন, অযথা কেন আপনি গরীব বেচারাদের নৌকা ছিদ্র করিয়া ফেলিলেন ?

এই ঘটনার বর্ণনায় আল্লাহ তাআলার ভাষায় হযরত খিযির (আঃ) বলেন–

আমি কি প্রথমেই বলি নাই যে, আপনি আমার কাজে ধৈর্যধারণ করিতে পারিবেন না।

মূসা (আঃ) বলিলেন, আমার ভুল হইয়া গিয়াছে। আমাকে ক্ষমা করুন।

অতঃপর উভয়ে আবার চলিতে আরম্ভ করিলেন। কিছুদূর গিয়া দেখিলেন সুন্দর চেহারাবিশিষ্ট একটি বালক অন্য বালকদের সাথে আনন্দ চিত্তে খেলা করিতেছে। হযরত খিযির (আঃ) খেলারত বালকদের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সেই সুন্দর চেহারাবিশিষ্ট ছেলেটিকে ধরিয়া আনিয়া হত্যা করিলেন।

হযরত মূসা (আঃ) তাঁহারই সম্মুখে একটি নিষ্পাপ খেলারত শিশুকে হত্যা করিতে দেখিয়া অধৈর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন–

আপনি কেন এই অবোধ বালকটিকে হত্যা করিলেন ? হযরত খিযির (আঃ) বলিলেন, আমার কথা কি সত্যে পরিণত হইল না যে, আপনি আমার কাজে ধৈর্যাবলম্বন করিতে পারিবেন না ? আপনি আমার সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া যেখানে ইচ্ছা চলিয়া যান।

হযরত মূসা (আঃ) বলিলেন, অতঃপর যদি কোন প্রশ্ন করি তবে আপনার নিকট হইতে বিদায় করিয়া দিবেন। আল্লাহ তাআলা এই প্রসঙ্গে বলেন–

"ইহার পর যদি আমি আর কিছু জিজ্ঞাসা করি তবে আমাকে আর আপনার সঙ্গে রাখিবেন না।"

islamibookbd.wordpress.com

আবার তাঁহারা পথ চলা আরম্ভ করিয়া এক গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গ্রামে একটি ভাঙ্গা প্রাচীর ছিল। হযরত খিযির (আঃ) বিনা পারিশ্রমিকেই সেই ভাঙ্গা প্রাচীরটি মেরামত করিয়া দিলেন।

হযরত মূসা (আঃ) বলিলেন, বিনা পারিশ্রমিকে আপনি কেন এই প্রাচীরটি মেরামত করিয়া দিলেন।

হযরত খিযির (আঃ) কোরআনের ভাষায় বলিলেন–

শঙ্ক্ষজ্ঞল্ল॥জক্ষজ্ঞব্দ"শু'গ্ল্শছন্দ"শুরু এখন আপনার ও আমার মধ্যে বিচ্ছিন্নতার সময় হইয়া গিয়াছে।

হযরত মূসা (আঃ) বলিলেন, হে খিযির (আঃ)! যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার উপরোক্ত তিনটি কাজের ব্যাখ্যা না দিবেন ততক্ষণ পর্যন্ত আমি আপনার নিকট হইতে যাইব না। আপনার এই সমস্ত কাজের মধ্যে নিশ্চয়ই অনেক কিছু শিক্ষণীয় আছে। সুতরাং আপনি ঐ সমস্ত কাজের কারণ বলার পরই আমি আপনার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিব।

হযরত খিযির (আঃ) বলিলেন, আমরা যেই নৌকায় নদী পার হইয়াছি তাহা ছিল কিছু সংখ্যক গরীব শ্রমিকের। শ্রমিকরা ঐ নৌকার আয় দ্বারাই সংসারযাত্রা নির্বাহ করে। আমাদের পিছনেই এক অত্যাচারী বাদশাহ আসিতেছিল। সে অক্ষত নৌকা দেখিলেই জোরপূর্বক লইয়া যায়। তাই আমি নৌকা ছিদ্র করিয়া দিলাম যাহাতে সে নৌকা লইয়া না যায়। আল্লাহ তাআলা এই প্রসঙ্গে এরশাদ করিয়াছেন–

নৌকাটি ছিল কিছুসংখ্যক গরীব শ্রমিকের যাহারা নদীতে মাঝিগিরি করিত। আমি উহাকে এইজন্য ত্রুটিযুক্ত করিয়া দিলাম যে, পিছনে এক বাদশাহ আসিতেছিল যে ভাল ভাল নৌকা লইয়া যায়।

বালকটি হত্যা করার কারণ এই যে, উক্ত বালকের পিতা-মাতা নেকবখত মুসলমান। আর বালকটি কুফরীর প্রতি আসক্ত। পিতা-মাতার ইচ্ছা বালকটিকে হত্যা করিয়া ফেলা। তাই আমি তাহাকে হত্যা করিয়া ফেলিলাম যেন তাহারা এমন কুসন্তান হইতে পরিত্রাণ পায়। আল্লাহ তাআলা তাহাদিগকে মেহেরবান এবং সৎ পুত্র দান করিবেন।

কোরআন পাকে বর্ণিত আছে ঃ

সন্তানের পিতা-মাতা মোমেন ছিল। আমার ভয় হইল, ভবিষ্যত জীবনে স্বীয় অবাধ্যতা ও কুফরীর দরুন পরকাল বরবাদ হইয়া যায় কিনা।

আমি যেই প্রাচীর মেরামত করিয়া দেই উহার মধ্যে দুই জন ইয়াতীমের ধনভাণ্ডার ছিল। প্রাচীর ধ্বংস হইয়া গেলে সেই সম্পদ বাহির হইয়া পড়িত এবং অন্য লোকে লইয়া যাইত। ফলে ইয়াতীমদ্বয় তাহাদের সম্পদ হইতে বঞ্চিত হইয়া পড়িত।

আল্লাহ তাআলা কোরআন পাকে এই সম্বন্ধে বলেন–

শহরে দুই জন নাবালেগ ইয়াতীম বাস করে। এই প্রাচীরদ্বয়ের নিচে তাহাদের সম্পদ লুকানো রহিয়াছে। তাহাদের পিতা সৎ ছিল। আল্লাহর ইচ্ছায় বালকদ্বয় বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহাদের সম্পদ বাহির করিয়া লইবে। ইহা তোমার প্রভুর রহমতের ব্যবস্থাপনা।

আমি আমার ইচ্ছায় কিছুই করি নাই। ইহাই ঐ ঘটনাত্রয়ের ব্যাখ্যা, যে বিষয়ে আপনি ধৈর্যধারণ করিতে সক্ষম হন নাই।

এই প্রাচীরের নিচে কি সম্পদ লুক্কায়িত ছিল এই সম্বন্ধে আলেমদের মধ্যে মতবিরোধ রহিয়াছে।

কেহ বলেন, টাকা-পয়সা ছিল। আবার কেহ কেহ বলেন, পাথরের টুকরা ছিল। তাহাতে দুইটি বাক্য লেখা ছিল। প্রথম বাক্য–

مَنْ اَيْقَنَ بِالْقَدْرِ كَيْفَ يَحْزُنُ

যে তকদীরে বিশ্বাসী সে কিভাবে চিন্তিত হইতে পারে?

অন্য বাক্যটি ছিল مَنْ اَيْقَنَ بِالْمَوْلٰى كَيْفَ يَحْزُنُ

যেব্যক্তি মাওলার উপর বিশ্বাসী সে কিভাবে নিশ্চিন্তে আনন্দ উপভোগ করিতে পারে?

ইহার পর মূসা (আঃ) বিদায় গ্রহণ করিলেন।

অতঃপর আত্মদর্শন ও আত্মগর্ব সম্বন্ধে বলিলেন, হে ভ্রাত! তোমরা লক্ষ্য করিয়াছ কি, অভিশপ্ত শয়তান কিভাবে বলিল, اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ আমি তাহার চেয়ে ভাল। অথচ সকলেই জানে, এই অহংকারীর পরিণতি কি হইয়াছিল? সুতরাং হে বন্ধুগণ! আর কতদিন আত্মদর্শনে আত্মগর্বে লিপ্ত থাকিবে। যাও, শয়তানের কাহিনীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া দেখ যে, আত্মদর্শনের অহমিকায় তাহার পরিণতি কি হইয়াছিল?

islamibookbd.wordpress.com

সপ্তবিংশ মজলিস

তওবা

তেসরা রবিউস সানী, শুক্রবার। অদ্যকার মজলিসে তওবা সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা হইতেছিল। হযরত শায়খ এরশাদ করিলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত আন্তরিকভাবে তওবা করিয়া মুখে উচ্চারণ করা না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তওবা কার্যকর হয় না এবং তওবার আসল উদ্দেশ্যও সাধিত হয় না। নিজের খেয়াল-খুশীমত পাপ করিয়া পরে যদি তওবা করা হয়, তবে সেই তওবাও আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্য নহে। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করিয়াছেন–

* يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تُوْبُوْا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا

হে মোমেনগণ ! আল্লাহর নিকট তওবা নসুহ কর।

অর্থাৎ আন্তরিকতার সাথে আল্লাহর নিকট তওবা কর। যে পাপ হইতে তওবা করা হইতেছে তাহা যেন পুনরায় করা না হয়। এইভাবে তওবা করিলে আল্লাহ মেহেরবান হইয়া হয়ত তোমার তওবা কবুল করিতে পারেন।

আল্লাহ ও বান্দার মধ্যস্থিত অন্তরায় পাপ এবং অপবিত্রতা। অন্তরঙ্গতার সাথে কৃত পাপ হইতে তওবা করার পর মানুষ যখন আর সেই পাপ না করে তখন এই অন্তরায় দূর হইয়া যায় এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের পথ বিপদমুক্ত হয়। পৃথিবীর প্রতি আসক্তি এবং পাপ– ইহাই অন্তরকে অপবিত্র করিয়া রাখে। তাই অন্তরকে যাবতীয় কামনা-বাসনা ও লোলুপতা হইতে দূরে রাখ, মোশাহাদা মোকাশাফার দ্বার তোমার জন্য উন্মুক্ত হইয়া যাইবে।

অন্তরের তওবার পর মুখের তওবার স্তর। অর্থাৎ খারাপ ও অশ্লীল কথাবার্তা বলা হইতে তওবা করিয়া মুখকে সংযত রাখাই মুখের তওবা। এই জন্য প্রথমে দুই রাকআত নফল নামায আদায় করত কেবলামুখী অবস্থায় কাকুতি-মিনতি করিয়া আল্লাহর নিকট বলিবে, হে পরওয়ারদেগারে আলম ! খারাপ কথা বলা হইতে এবং যে কথায় তুমি অসন্তুষ্ট হও এমন কিছু বলা হইতে আমাকে, আমার জিহ্বাকে সংযত রাখ। পরনিন্দা হইতেও আমাকে বিরত রাখ।

প্রত্যুষে নিদ্রা হইতে উঠার পর সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মুখকে অনুরোধ করিয়া বলে, ওহে মুখ ! তুমি যদি সংযত থাক তবে আমরা ধ্বংস হইব না।

আল্লাহ পাক জিহ্বাকে সৃষ্টি করিয়া এরশাদ করিলেন, ওহে জিহ্বা ! আমার স্মরণ, আমার যিকর-আযকার করার জন্যই আমি তোমাকে মানুষের একটি শ্রেষ্ঠ অঙ্গ হিসাবে সৃষ্টি করিয়াছি। আমার কালাম ব্যতীত যেন অন্য কোন কিছু তোমা দ্বারা উচ্চারিত না হয়। তুমি আমার আদেশের অন্যথা করিলে অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অবশ্যই বিপদাপন্ন হইবে। তাই তোমাদের কর্তব্য তোমাদের জিহ্বা যেন সর্বদা আল্লাহর যিকর এবং পবিত্র কালাম তেলাওয়াতে লিপ্ত থাকে।

অতঃপর পীর ও মুরশিদ মানুষের রিযক বা জীবিকা সম্বন্ধে এরশাদ করিলেন, আল্লাহ তাআলা যাহার ভাগ্যে যেই জীবিকা নির্ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন সে তাহা অবশ্যই পাইবে। আর যাহা কাহারও ভাগ্যে রাখেন নাই সে যত চেষ্টাই করুক না কেন কিছুই পইবে না। সুতরাং যাহার অন্তকরণ জীবিকা অর্জনে লিপ্ত না হইয়া এবাদত-বন্দেগীতে মশগুল থাকে, সে-ই শরীয়ত ও তরীকতের পথের যথার্থ পথিক। সুতরাং তুমি একান্তভাবে দৃঢ়তার সাথে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখ– অনুসন্ধান ব্যতীতই তুমি তোমার ভাগ্যের নির্ধারিত বস্তু পাইবে।

তুমি নিজেকে তোমার একচ্ছত্র মালিকের সন্ধানে রাখ, তাহা হইলেই তোমার ভাগ্যে যাহা কিছু আছে তাহা তোমাকে সন্ধান করিয়া ফিরিবে। কোন মুসলমান যখন দুনিয়ার সন্ধানে লিপ্ত হইয়া পড়ে তখন দুনিয়া তাহার নিকট হইতে দূরে সরিয়া যায়। আর যে মালিকের সন্ধানে নিয়োজিত থাকিয়া দুনিয়ার প্রতি উদাসীন থাকে, তখন দুনিয়া ও দুনিয়ার যাবতীয় কিছু স্বেচ্ছায় তাহার নিকটে আসিয়া ধরা দেয়। অথচ সে দুনিয়াকে পূতি দুর্গন্ধময় লাশ মনে করিয়া তাহা হইতে সরিয়া থাকে।

ওহে দরবেশগণ ! আল্লাহর প্রতি ভরসাকারীগণ জীবিকা বা অন্যান্য কোন কিছুর সম্বন্ধে মোটেই চিন্তিত নহেন। কারণ, তাঁহারা বিশ্বাস করেন, ভাগ্যে লিখিত বস্তু অবশ্যই আল্লাহ দান করিবেন। তবে আর চিন্তা-ভাবনা কেন ?

সুতরাং তোমরা আল্লাহর কাজে নিয়োজিত থাক এবং একাগ্রতার সাথে তাঁহার এবাদত-বন্দেগী কর। তারপর দেখ আল্লাহ তোমাদের জন্য কত নেয়ামত পাঠাইয়া দেন।

islamibookbd.wordpress.com

ওহে বন্ধুগণ ! শত চেষ্টা করিলেও নির্ধারিত ভাগ্যের কোন প্রকার রদবদল হইবে না। কোন কোন অজ্ঞ লোকের ধারণা, নিজস্ব এলাকা ছাড়িয়া অন্য কোথাও গেলে আমার ভাগ্যের পরিবর্তন হইবে, অধিক ধন-সম্পদের মালিক হইব। এমন ধারণা করা কবীরা গোনাহের মধ্যে পরিগণিত। যাহারা এমন কথা বলে তাহারা আল্লাহর প্রতি অবিশ্বাসী। কারণ, তুমি যেখানেই যাইবে সেখানেই আল্লাহ আছেন এবং তিনিই তোমার ভাগ্যের নিয়ন্তা।

একবার এক ব্যক্তি ভাগ্যের পরিবর্তন করার জন্য নিজের শহর ছাড়িয়া অন্য শহরে যাওয়ার মনস্থ করিল। শহর পরিত্যাগ করার পূর্বে সেই শহরের একজন বুযুর্গের নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে গেল। বুযুর্গ জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন যাইবে ? সে বলিল, হযরত বড় অভাব-অনটনে পড়িয়া গিয়াছি। সেখানে গিয়া দেখি ভাগ্যের পরিবর্তন হয় কিনা ? বুযুর্গ বলিলেন, ভাল কথা। তুমি যখন সেখানে পৌঁছিবে তখন তথাকার খোদাকে আমার সালাম দিও।

বুযুর্গের কথা শুনিয়া সে তো হতভম্ব। জিজ্ঞাসা করিল, হযরত ! সেই শহরে আবার অন্য খোদা কোথা হইতে আসিবে ? বুযুর্গ বলিলেন, নাদান ! যখন এতটাই বুঝিতে পারিতেছ যে, ঐ শহর এই শহর এবং সারা বিশ্বের খোদা একই জন এবং এখানে বা সেখানে তুমি তাহাই অর্জন করিতে পারিবে যাহা তোমার ভাগ্যে লিখিত রহিয়াছে, তবে কেন এত চিন্তা। যাও, একাগ্রতার সাথে আল্লাহর কাজে লাগিয়া থাক এবং দেখ তিনি তোমার জন্য কি ব্যবস্থা করেন।

অতঃপর তিনি হাত চুম্বন করা সম্বন্ধে বলিলেন, একে অন্যের হাত চুম্বন করা হুযুর (সাঃ) এবং তাঁহার পূর্ববর্তী নবীদের সুন্নত। যেব্যক্তি আন্তরিক ভক্তি-শ্রদ্ধার সাথে কোন বুযুর্গ ও পীরের হাত চুম্বন করে, আল্লাহ তাহার যাবতীয় পাপ ক্ষমা করিয়া দেন, যেন সেব্যক্তি আজই মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ট হইল। তাই ইহকাল পরকালের মঙ্গলার্থই শায়খ ও বুযুর্গদের হাতে চুম্বন করা উচিত।

হযরত দাউদ (আঃ) যখন দরবারে বসিয়া বিচার করিতেন তখন বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের কোন বুযুর্গ সেখানে উপস্থিত হইলে তিনি আসন ছাড়িয়া উঠিয়া বুযুর্গের সাথে মোসাফাহা করিতেন এবং তাঁহার হাত চুম্বন করত আকাশের দিকে মুখ তুলিয়া বলিতেন, হে মাবুদ ! এই বুযুর্গের হাত চুম্বনের বরকতে তুমি আমার ইহকাল পরকাল মঙ্গলময় কর।

হযরত ইউসুফ (আঃ) হারাইয়া যাওয়ার পর পিতা হযরত ইয়াকুব (আঃ) রাজপথে দাঁড়াইয়া প্রত্যেক গমনাগমনকারীর হাত ভক্তিভরে চুম্বন করিতেন এবং বলিতেন, বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের বুযুর্গদের হাত চুম্বন এবং তাঁহাদের দোআর বরকতেই হয়ত আল্লাহ আমার হারান মানিক ইউসুফকে আমার বুকে ফিরাইয়া দিতে পারেন।

হুযুর আকরাম (সাঃ) প্রত্যহ প্রভাতে এক বৃদ্ধার নিকট যাইতেন এবং বলিতেন, ওহে বৃদ্ধা ! তুমি আমার জন্য আল্লাহর নিকট ভাল দোআ কর।

এক বুযুর্গ বলেন, আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, কোন ব্যক্তি যদি ভক্তিভরে কোন বুযুর্গের হাত চুম্বন করে তবে আল্লাহ অবশ্যই তাহাকে পরকালে মুক্তি দান করিবেন। কারণ, যেব্যক্তি কোন বুযুর্গের হাত ধারণ করিল সে যেন হুযুর (সাঃ)-এর মোবারক হাতই ধারণ করিল।

হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ ইসলামের ইতিহাসে একজন অত্যাচারী, নির্মম, নিকৃষ্ট শাসনকর্তা হিসাবে চিহ্নিত হইয়া রহিয়াছেন। তিনি ইনতেকাল করার পর লোকে তাহাকে স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনার অবস্থা কি ?

হাজ্জাজ বলিলেন, ধ্বংসের পথে পা দিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছি। কিন্তু একটি বিষয়ের প্রতি আমার ভরসা রহিয়াছে, হয়ত তাহার বরকতে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করিয়া দিবেন। লোকে জিজ্ঞাসা করিল, সেই কাজটি কি ?

হাজ্জাজ বলিলেন, আমাকে বলা হইয়াছে যে, তুমি অমুক দিন হাসান বসরীর দরবারে গিয়া ভক্তিভরে তাঁহার হাত চুম্বন করিয়াছিলে। তাহার বরকতেই তোমাকে ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে।

islamibookbd.wordpress.com